তুমি কে ?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

 উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

তুমি কে

বেগমপুর স্টেশনে জল খেতে নেমেছি, টিউবওয়েলটা খুব নিচু ছিল, আঁজলা পেতে জল নিতে গিয়ে আমাকে অত্যন্ত বেশী নিচু হতে হচ্ছিল। এরকম ভাবে জল খেয়ে তৃষ্ণা কোনো রকমে মিটলেও তৃপ্তি হয় না একটুও। অতখানি কোমর বেঁকাবার জন্য সারা শরীরে একটা বিসদৃশ্য ব্যাপার হয়, জুতোয় যাতে জলের ছিটে না লাগে সেইজন্য পা দুটো রাখতে হয় অনেক দূরে, ভারী ঝঞ্ঝাট। অথচ গরমের দুপুরে ট্রেন জার্নির সময় তেষ্টা পাবেই।

পাশেই দু'জন লোক, তাদের হাতে ফ্লাস্ক ও ছোট গেলাস, তাদের ভারী সুবিধে। তাদের কাছ থেকে আমি গেলাস চাইতে পারি না, আমার স্বভাব সে রকম নয়। কিন্তু আর একটি চিমসে চেহারার লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে অবলীলাক্রমে বললো, দাদা, আপনাদের গেলাসটা একটু দেবেন?

ফ্লাস্ক হাতে লোক দু'টি বেশ আন্তরিকভাবেই বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিন না!

এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। একজনের গেলাস আছে, আর একজন সেটা চাইবে। ফেরত দেবার সময় সেটা ধুয়ে ফেরত দিলেই সব দিক শোভন হয়। তবু কেন আমি চাইতে পারলাম না? বাড়িতে আমারও একটা ফ্লাস্ক আছে, কিন্তু কোথাও বাইরে যাবার সময় সেটা নেবার কথা কিছুতেই মনে পড়ে না!

ততক্ষণে আমার বুকের কাছে জামা ভিজে গেছে, কিন্তু তেষ্টা মেটেনি। চিমসে চেহারার লোকটি "দেখি দাদা" বলে আমার হাতের পাশ থেকে গেলাস পেতে পর পর তিন গেলাস জল খেল, পরিতৃপ্তির সঙ্গে আঃ শব্দ করলো, তারপর গেলাসের মালিকদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, উদারভাবে আমাকে বললো, ওরকমভাবে পারবেন না। এই যে, এটা নিন না!

এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশনে থামার কথা ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে নানারকম রহস্যময় কারণে ট্রেন থামে। যে কোনো মুহূর্তেই আবার

ছাড়তে পারে। ফ্লাস্ক-হাতে লোক দু'টি কি ব্যস্ত হয়ে পড়েনি? তাদের ফ্লাস্কে জল ভরা হয়ে গেছে, তবু তারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। চিমসে চেহারার লোকটি কিন্তু আমার হাতে গেলাসটা তুলে দিয়ে নির্বিবাদে সরে পড়েছে। ধন্যবাদ-টন্যবাদ জানাবার ব্যাপারেও তার মাথাব্যথা নেই। যাই হোক, গেলাসটা ব্যবহার করতে আমি আর দ্বিধা করলাম না, কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে জলপান করে আত্মাকে আরাম দিলাম খানিকটা।

ভালো করে গেলাসটা ধুয়ে একটু বিগলিত মুখে ফেরত দেবার সময়, সেই দুজনের একজন হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে নিতে সোল্লাসে আমাকে বললো, আরেঃ, ছোটকু না?

আমি চুপসে গেলাম। নিজের চেহারার চেয়ে সরু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দে। জানি, একটু বাদে ওদের ভুল ভাঙবেই। একজন আমার কাঁধে চাপড় মারার জন্য হাত বাড়াতে উদ্যত হয়ে বললো, কি রে ছোটকু! বহুদিন বাদে—

পুরুষের স্পর্শ আমার কাছে অসহ্য, অপরিচিত পুরুষদের তো আরও। কোনোদিন আমি কোনো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরিনি, গুরুজনদের কখনো পিঠ চাপড়ানোর সুযোগ দিইনি।

এবার আমাকে বলতেই হলো, সামান্য হাসিও যোগ করলাম অবশ্য, আমার নাম ছোটকু নয়, আপনাদের ভুল হয়েছে—

লোক দু'টি কঠোর অবিশ্বাসীর মতন চোখে চেয়ে থাকে। আমি যে ছোটকু নই, এটা যেন আমারই অপরাধ। সেই মুহূর্তে আমার ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পারলাম না। গেলাস তো ফেরত দেওয়া হয়েই গেছে, এখন একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাবো? আগের লোকটি তো ধন্যবাদটুকুও দেয়নি। কিন্তু ওরা দু'জন যেন আমার সঙ্গে আরও কথা বলতে চায়।

লোক দু'টি দু'জনেই নিখুঁত কাটের প্যাণ্ট-সার্ট পরে আছে, দু'জনের চোখে রোদ-চশমা। হাতের ফ্লাস্কটাও দামী। ছোটকুর কাছে কি এরা টাকা পায় নাকি? আমার কাছে সেই টাকা দাবি করবে?

একজন চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে হাসলো, বলল, মাপ করবেন, তাহলে ভুল হয়ে গেছে। সাইড থেকে অবিকল আমাদের ছোটকুর মতন দেখতে।

অন্যজনের অবিশ্বাস তখনো কাটেনি। অপ্রসন্ন মুখে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। খুব অস্বস্তি লাগছে আমার। আমি কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমি তো বললামই, আমার নাম ছোটকু নয়, তারপরও ওরকম কুটিলভাবে তাকাবার কি আছে?
সেই লোকটি কথা বলার সময় বেশ অমায়িকভাবেই বললো, ভুল হয়েছে, সত্যিই ভুল হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করেন নি তো?
—না, না, মনে করার কি আছে?
—আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন?
—হ্যাঁ।
আরেকজন জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আপনার নামটা কি?
—জ্যোতি রায়চৌধুরী। আমার কোন ডাক নাম নেই।
অবিশ্বাসীর চোখ আর নেই, দুজনেই এখন ভদ্র আর সহৃদয়। ওরা দুজনেও নিজেদের নাম ও বিলিতি ফার্মে চাকরির কথা উল্লেখ করলো। ওদের নাম ভুলে যেতে আমার একটুও সময় লাগলো না। স্মৃতির মধ্যে একটু আলো-হাওয়া খেলাবার জন্য আমি অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু চটপট বিদায় দিই।
খাতির করে একজন আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এমন চমকে গিয়েছিলাম, অবিকল আমাদের বন্ধু ছোটকুর মতন দেখতে। আরও অবাক হয়েছিলাম, ছোটকু আমাদের দেখেও কথা বলছে না
আরেকজন বললো, জানার পর অবশ্য বোঝা যায়, অনেক অমিল আছে। কিন্তু প্রথমটা সাইড থেকে দেখলে একেবারে--
আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বন্ধু ছোটকুর ভাল নাম কি?
-অসিত মজুমদার। ও আছে আপনার ইয়েতে, মানে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে—
অসিত নামটা আমার চেনা। আমি মনে মনে আশা করেইছিলাম যে ওরা অসিত মজুমদারের কথাই বলবে। ঐ নামের কোনো লোককে অবশ্য আমি চিনি না, কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু এর আগেও অনেকে আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে। সিনেমার শো-ভাঙার শেষে, ভিড়ের বাসে, ক্রিকেট খেলার সময় গ্যালারিতে মাঝে মাঝেই লোকে আমাকে দেখে বলে, আরে, অসিত না? অনেকে সরাসরি আমাকে অসিত ভেবে কথা বলতে সুরু করে দেয়, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছে, অসিত

আমার ভাই কি না? এটা ঠিক, ঐ অসিত মজুমদার আমার চেয়ে অনেক জনপ্রিয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অনেক বেশী। আজ পর্যন্ত যত লোক আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে, তার তুলনায় খুব কম লোকই আমাকে দেখে সত্যিকারের নাম ধরে ডেকে উঠেছে, 'আরে, জ্যোতি না?'

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না। অসিত মজুমদার সম্পর্কে আমার মনে মনে বেশ একটা রাগ আছে। প্রত্যেক মানুষই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য চায়, অন্তত চেহারায় সে অন্যদের থেকে আলাদা। অসিত মজুমদার কেন আমাকে সেটুকু বৈশিষ্ট্য থেকেও বঞ্চিত করবে? আমার চেয়ে তার ঢের সুন্দর চেহারা হলেও আমার কোনো আপত্তি ছিল না। তাছাড়া, ব্যাপারটাতে একটু ভয় ভয়ও করে। আমারই মতন চেহারার আর একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে, কলকাতা শহরেই —সে কখন কি করবে, তার জন্য যদি লোকেরা আমাকে দায়ী করে? আমি এবার থেকে দাড়ি রাখবো? কিন্তু আমি কেন, চেহারা পাল্টাতে হয় ঐ অসিত মজুমদার পাল্টাক।

যাই হোক, ঐ লোক দুটির সঙ্গে আমি আর কথা বাড়াতে চাইলুম না। প্রসঙ্গ পাল্টে বললুম, ট্রেনটা হঠাৎ এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলো কেন? কখন ছাড়বে?

—এখনও তো সিগন্যাল দেয়নি।

যেন আমি সিগন্যাল দিয়েছে কিনা দেখতে যাচ্ছি, এই ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে আর অনর্থক কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ার এই সুযোগ। সিগন্যালের আলো খোঁজার জন্য খানিকটা এগিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে তাকালাম। তারপর সেখান থেকেই ঐ লোক দু'টির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বললাম, আচ্ছা, চলি।

নিজের কামরায় ফিরে শুনলাম, ট্রেন কখন ছাড়বে ঠিক নেই। পেছন দিকের একটা বগিতে নাকি আগুন লেগেছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, আগুন নেবানো হয়ে গেছে, কিন্তু দু'-একটা ছোটখাটো মেরামতের ব্যাপার আছে। কিছু যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে নেমে গেছে সেই ঘটনা দেখতে, বাকিরা হাত পা ছড়িয়ে বসেছে ঢিলে ঢালা ভাবে। আমার বসার জায়গাটা এর মধ্যেই সরু হয়ে গেছে, পাশের দুই ভদ্রলোক তাঁদের শরীর চওড়া করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। 'দাদা সরে

বসুন', কিংবা 'প্লিজ আমার জায়গাটা' এসব কথা আমার মনের মধ্যে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু মুখে বলতে পারি না। সব সময় আমার মনের মধ্যে এই অদ্ভুত ভুল ধারণাটা থেকে যায় যে, অন্য মানুষরা আমার মনের কথা বুঝবে। তাছাড়া, এটা তো বোঝাবুঝির ব্যাপারও নয়। কিছু লোক যে আগুন দেখতে নেমে গেছে, তাদের জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে, আমি কি সেখানে বসে পড়তে পারি? জানলার ধারে একটা ভালো জায়গা দেখে?

ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলে বসার জায়গা নির্দিষ্ট থাকতো, থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটলে বসার জায়গা পাওয়া সম্পর্কে খুব বেশী প্রত্যাশা থাকে না—দৈবাৎ পেয়ে গেলেই আনন্দ লাগে। এমনকি থার্ড ক্লাসে বসার জায়গার জন্য ঝগড়া করলেও বেমানান দেখায় না। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে সীটের জন্য একটা দাবি থাকে মনে মনে, অনেক সময় পাওয়া যায় না—তখন মনে হয়, দাঁড়িয়েই যদি যেতে হবে, তাহলে পয়সা নষ্ট না করে থার্ড ক্লাসে গেলেই পারতাম। আসলে আমি থার্ড ক্লাস থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি, কিন্তু এক লাফে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে না পেরে শূন্যে ঝুলে আছি।

যদিও আজকাল নিজের পয়সায় ট্রেন জার্নি করি খুবই কম। আমার কম্পানি আমাকে ফার্স্ট ক্লাসেরই ভাড়া দেয়। এমনকি, ব্যক্তিগত কারণে নিজের কোথাও যাবার থাকলেও সেখানে কম্পানির একটা ট্যুর প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলি। তাতেও খুশী নই—এর পরেও আবার টি. এ. বিল থেকে কিছু বাঁচাবার জন্য ফার্স্ট ক্লাসের বদলে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। অথচ ঠিক পয়সার লোভের জন্যও নয়!

বিরস মুখে কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। অসিত মজুমদার ট্রেনে কোন্ ক্লাসে ট্রাভেল করে? বসার জায়গা না পেলে অসিত মজুমদার কি ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু করে দেয়? মুখ দেখে নাকি মানুষের চরিত্র বোঝা যায়! তাহলে একই রকম মুখের দু'জন মানুষের চরিত্র কি এক হবে?

একটা সিগারেট ধরাবার পর অকারণে আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে

গেল। মনে হতে লাগলো, আমি কি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, ট্রেনের টিকিটখানা ঠিক আছে কিনা! বাড়ির চাবিটা ফেলে আসিনি তো? বাথরুমের আলোটা নিবিয়ে ছিলাম আসবার সময়? এগুলো অপরাধ নয় মোটেই, ভুল বলা যেতে পারে। তবু মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগে। সে রকম তো কিছু ভুলও করিনি আজ। তবু কেন মন খারাপ লাগছে? যতবারই আমাকে অন্য কেউ এসে অসিত মজুমদার বলে ভুল করেছে, ততবারই আমি একটু মন-মরা হয়ে গেছি। আমাকে জ্যোতি রায়-চৌধুরী বলে লোকেরা ঠিকঠাক চিনতে পারে না কেন? একটু দুর্মনস্ক হয়ে আমি নিজের জায়গাতেই চেপে চুপে বসে পড়লাম।

অসহ্য গরম। গাড়ি চলার সময় তবু একটা কষ্ট হয় না, কিন্তু প্লাটফর্মে থেমে থাকা গাড়িতে বসে যেন আগুনে সেদ্ধ হচ্ছি। তাছাড়া পাশের লোক দু'জনের গায়ে গা ঠেকে আছে, তাই এক অস্বস্তি। ভন্ ভন্ করছে দুটো নীল ডুমো মাছি। ট্রেন ছাড়ার নাম নেই, এভাবে আর বসে থাকা যায় না। সঙ্গে কোনো বই কিংবা পত্র-পত্রিকা আনিনি, সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে আমার কোনোদিনই উৎসাহ নেই। সময় আর কাটতেই চায় না।

প্রত্যেকবারই ট্রেনে চাপার সময় মনে হয়, অযথা বই মুখে নিয়ে বসে সময়টা নষ্ট করবো না, জানলা দিয়ে দেখবো মাঠ, খোলা আকাশ, খাল, এঁদো পুকুর, টেলিগ্রাফের তারে বসা ফিঙে—কিন্তু প্রত্যেকবারই টের পেয়েছি, এসব বেশীক্ষণ দেখতে ভালো লাগে না। ভেবেছি, নিজে নিরপেক্ষ থেকে কামরার মানুষজনের আচরণ দেখবো। কলকাতা শহরের হুড়োহুড়ির মধ্যে তো মানুষজনের দিকে চেয়ে দেখার সময় হয় না। বরং ট্রেনের কামরায় চুপচাপ বসে থাকলে দেখা যায়, পৃথিবীতে কত রকমের মানুষ। কিন্তু এই ছোট্ট কামরাটায় প্রায় পঞ্চাশ যাটজন নারী-পুরুষ, তাদের কারুর দিকেই বেশীক্ষণ চোখ রাখতে ইচ্ছে করে না, এমনকি যে তিনজন যুবতী মেয়ে রয়েছে, তাদের দিকেও না। তাদের চেহারা ও ব্যবহারেও একটা কাঁচকলা সেদ্ধর ভাব আছে।

আমার দু'পাশের দু'জন লোক আমার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের চেষ্টায় আমার কাছ থেকে শুধু হুঁ আর না উত্তর পেয়ে নিবৃত্ত হয়েছে। এখন তারা নিজেদের মধ্যে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে।

আমি মাঝখানে বসে, দু'পাশ থেকে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে ওরা। আমি বুঝতে পারছি, ওদের বেশীর ভাগ কথাই ভুল। সুইডেন সম্পর্কে আমিও প্রায় কিছুই জানি না, কিন্তু এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, অন্য লোকেরা ভুল বললে, তাদের গলার আওয়াজ শুনেই অনেক সময় সেটা টের পাওয়া যায়। কোন একটা বিষয় সম্পর্কে খুব কম জেনেও বাঙালীরা অনেকক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। এটা বাঙালী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একজন শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষকদের মাইনে বাড়াবার আন্দোলনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন—এই ঘটনা থেকে কি প্রমাণ করা যায় যে সুইডেন শিগগিরই সোশ্যালিষ্ট হয়ে যাবে? আমার কাছে তো ওটা একটা রসিকতা মনে হলো। সাহেবদের ওরকম অনেক রসিকতা আছে।

ট্রেন এখনো ছাড়ছে না, আমি আবার উঠে কম্পার্টমেণ্টের বাইরে নেমে দাঁড়ালাম। বাইরে বেশ হাওয়া আছে, রোদ্দুর চলে গেছে অন্যদিকে। পায়চারি করতে মন্দ লাগলো না। ট্রেনটার লেজের দিকে এখনও অনেক লোকের ভিড, ওখানে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানার কৌতূহল আমার হয় না। তবে, দূর থেকে লোকের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, খুব বেশী উদ্বেগ বা বিরক্তি নেই, খানিকটা কৌতুকই রয়েছে।

পায়চারি করছিলাম, হঠাৎ একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার দিকে চোখ পড়লো। সেই দু'জন লোক অসিত মজুমদারের বন্ধু, যাদের নাম আমি মনে রাখার চেষ্টা করিনি, জানলা দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু চোখ আবার যাবেই। এবার লোক দু'টির পাশে তিনটি মেয়ে, তারা উঠে এসেছে জানলার কাছে, চোখ দিয়ে বলছে, কই, কই, কোন্ লোকটা?

আমার এটা ভালো লাগার কথা নয়। আমাকে তো দেখছে না, দেখছে ওদের চেনা একজন লোকের চেহারার মতন আর একজন মানুষকে। মেয়ে তিনটি, আমাকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না, পাশের সঙ্গীদের খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করছে, কোথায়? কোন্ লোকটা দেখতে পাচ্ছি না তো?

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেলাম। আমার ভ্রূ কুঞ্চিত। আবার আমার মন খারাপ হবার উপক্রম হলো। অন্য একজনের

কথা ভেবে আমাকে দেখছে, এটা কখনো ভাল লাগতে পারে? আমি সিনেমা স্টার নই, ক্রিকেট খেলোয়াড় নই, কোনোদিক থেকেই কোনো বিখ্যাত লোক নই—শুধু আমাকে দেখার জন্যই কেউ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে না। অসিত মজুমদার সম্পর্কে ঠিক ঈর্ষাবোধ করলুম না, তবে সারা পৃথিবীকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করলো, একবার শুধু আমার জন্যই আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। হন হন করে এগিয়ে গেলাম ইঞ্জিনের দিকে, সেটা ছাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে তাকিয়ে রইলাম দুটো পলাশ গাছের দিকে। একই রকম উচ্চতায় দু'টি গাছ, ঝাঁকে ঝাঁকে লাল ফুল ফুটেছে। গাছেরা সাধারণত এক রকমই দেখতে হয়। চট্ করে আলাদা ভাবে চেনা যায় না।

একটা ভুল করেছি, আমার কামরার উল্টো দিকে চলে এসেছি। ফিরতে হলে আবার ওদের কামরার সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। ফেরার সময় মুখখানা কঠিন ও বিদ্রূপময় করে রাখলাম, ওদের দিকে তাকাবোই না ঠিক করেছিলাম। তবু ঠিক জায়গায় এসে হঠাৎ চোখ চলে যায়। এবার ওরা সবাই জানলার কাছে ভিড় করে নেই, একটি মেয়ে শুধু জানলা দিয়ে মুখ বার করে খুব খুঁজছে। আমাকে নিশ্চয়ই। আমাকে না, আমার চেহারাকে। এ' এক মুহূর্ত আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না!

আমার স্মৃতির মধ্যে আমি ভিড় বাড়াতে চাই না, অবান্তর নাম কিংবা মুখ মনে রাখার চেষ্টাই করি না। কিন্তু এরকম একটি মুখ সারাজীবন মনে রাখার মতন। মেরুন রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি, ব্লাউজের রংও ঐ, কানে মুক্তোর দুল, অল্প কোঁকড়ানো এক মাথা চুল, সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দূর থেকে বোঝা যায় না—খুব ফর্সা নয় বোধ হয়, কিন্তু রোদ্দুরের রশ্মিতে মুখখানা ঝকঝক করছে, ভুরু ও চোখের পাতা ঘন কালো, এঁকেছে কিনা জানি না, তবে এত দূর থেকেও যেন আমি তার অক্ষি পল্লব দেখতে পাচ্ছি, তার পাতলা ঠোঁট ও চিবুকের রেখায় কি সৌন্দর্য দেখতে পেলাম আমি জানি না—আমি তার সম্পূর্ণ মুখখানা স্মৃতিতে এঁকে রাখার জন্য একবার চোখ বুঁজলাম। পরক্ষণেই চোখ খুলে আর একবার মিলিয়ে নেবার জন্য আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হয়ে গেল, ওর চোখে বিস্ময়, আমি অল্প একটু হাসলাম। মেয়েটিও মিলিয়ে দেখতে চাইছে, আমি সত্যিই অসিত মজুমদার কি না! হয়তো অসিত মজুমদারের সঙ্গে ওর অনেকদিন দেখা হয়নি, তাকে

খুঁজছে। অসিত মজুমদারের বদলে আমাকে পেলে ওর চলবে না?
সেই মুহূর্তে ট্রেন ছাড়ার হুইসল দিল।
ছুটতে ছুটতে এসে আমি আমার কামরায় উঠলাম। মেয়েটির মুখও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো। আমি তাকে পেছনে ফেলে আসিনি। আমার জায়গাটা এখন সম্পূর্ণ অন্যের দখলে চলে গেছে, তবু আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করলাম না, দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে। এখন ঐ মেয়েটির মুখ আমার বুকের মধ্যে খোদাই করে রাখা দরকার - এখন কারুর সঙ্গে কথা বললে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। একজন লোক সহৃদয়ভাবে বললো, আসুন না, এখানে আসুন, একটু চেপে চুপে বসলে—। কথা না বলে আমি হাত তুলে তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম।
আসানসোলে নেমে আমার আর একবার ইচ্ছে হলো মেয়েটিকে দেখার। কিন্তু ওদের কামরার সামনে নির্লজ্জের মতন তো আর ঘোরাঘুরি করা যায় না! ছোট সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় একবার শুধু আড় চোখে ওদের কম্পার্টমেণ্টের দিয়ে তাকালাম। জানলার কাছে কেউ নেই, কামরাটাও ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। ওরাও কি আসানসোলে নেমেছে? ভিড়ের মধ্যে কারুকে দেখা গেল না।
স্টেশনের কাছেই হোটেল খুজে নিতে বেশী সময় লাগলো না আমার। আসানসোলে এসে অন্য কোনোবার হোটেলে থাকি না, মনীষকাকার বাড়িতেই উঠতে হয়। এবার হোটেলে ওঠার কথা প্রথমেই মনে এলো। জি. টি. রোডের ওপরেই হোটেল, দোতলায় দক্ষিণ খোলা ঘর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। জুতো মোজা খুলে পায়ে চটি গলিয়ে আরাম বোধ করলাম বেশ। একটু বাদেই ম্যানেজার হোটেল রেজিস্টারখানা নিয়ে এলো নাম-টাম লেখবার জন্য। কলমটা খুলে নিজের নাম লিখতে গিয়েও হঠাৎ মত বদলে ফেললাম। মনে হলো, একটা খেলা শুরু করলে তো মন্দ হয় না! নামের ঘরে লিখলাম, অসিত মজুজদার। অফিসের নাম লিখলাম, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।
খাতাটা বন্ধ করে ম্যানেজারের হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। শিস দিয়ে একটা গান শুরু করলাম।

॥ দুই ॥

কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে মনে হয়, এই পৃথিবীটা আমার। আমিই এই সপ্ত সাগরমেখলা দ্বীপের অধীশ্বর। এই মনে হওয়ার মধ্যে ঠিক স্বার্থপরতা নেই। এবং সপ্ত সাগরমেখলা দ্বীপ বললুম বটে, কিন্তু পৃথিবী বলতে এই সমস্ত জল-স্থল-আকাশ কিংবা ভূগোল ক্লাসের গ্লোবটার কথাও সব সময় মনে পড়ে না। আমঝরিয়ার ডাক-বাংলোর সামনে সিমেণ্টের গোল বেঞ্চে বসলে সামনে যে বিশাল নীচু উপত্যকা ও নির্জনতার মধ্যে ঝুঁকে পড়া আকাশ দেখা যায়—তখন মনে হয় এটাই পৃথিবী। রেললাইনের ধারে পানাপুকুর, বাবলার ঝাড় ও অড়হরের ক্ষেত দেখলেও পৃথিবী মনে হয়, মনে হয় এগুলো সব আমার। এখানকার হোটেলে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম পাবো, এটা আশাই করিনি। বেশ খুশী খুশী বোধ করলুম। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতেই ঢুকলাম বাথরুমে, স্নান করলাম অনেকক্ষণ ধরে, নতুন সাবানের সুগন্ধে মন ভরে গেল। ভাঁজ ভাঙা পাজামা ও গেঞ্জি পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শরীর ও মন সত্যি বেশ হাল্কা ফুরফুরে লাগতে লাগলো। অনেকদিন এরকম মন ভালো থাকে নি—খানিকটা রহস্যময়ই লাগছে। অস্ফুট ভাবে বললাম, এই পৃথিবীটা আমার। হ্যাঁ, সত্যি আমার একার, নিজস্ব।

কি রকমভাবে আমার? আমি অবশ্য এই পৃথিবীর সম্রাট হতে চাই না, এর মালিকানা চাই না। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম ঃ ছেলেবেলায় শিমুলতলা বেড়াতে গিয়ে একটা চমৎকার বাড়ি দেখেছিলাম, ঠিক দেখেছিলাম বলা যায় না—বাইরে থেকে বাড়িটার প্রায় কিছুই দেখা যায় না – এমন উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দু'মানুষ সমান উঁচু দেয়াল সেই বাড়িটার সম্পূর্ণ সীমানা ঘিরে রয়েছে, তার ওপর কাচ-ভাঙা বসানো। শুনেছিলাম বাড়ির মালিক দারুণ শৌখিন, অনেক রকম ফুল আর দুর্লভ সব ফলের গাছ আছে, তার মধ্যে ফোয়ারা ঝর্ণাও নাকি তৈরি করা—কিন্তু ঐ বাড়ির মধ্যে ঢোকা দুঃসাধ্য। বিশিষ্ট লোকেরা অনুমতি নিয়েই শুধু ঢুকতে পারেন। বিরাট লোহার গেটের সামনে দু'জন পাঠান শান্ত্রী—সেই গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে এক ঝলক দেখে একটুও

আশা মিটতো না।

কিন্তু সেই বাড়িটা শেষ পর্যন্ত অদেখা থাকেনি। লাট্টু পাহাড়ে পিকনিক করতে গিয়ে অরুণমামার দূরবীনটা পেয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে সেই দেয়াল-ঘেরা বাড়িটা চোখে পড়েছিল। দূরবীনের মধ্যে তাকিয়ে সেই বাড়িটা কত কাছে এসে গেল। সারি সারি কমলালেবু গাছে পাতিলেবু সাইজের কমলা ফলে আছে, মাচায় লতানে আঙুর। শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা চৌকো, পুকুরের মাঝখানে একটা ফোয়ারা, খুব তোড়ে জল বেরুচ্ছে, পুকুরের চার পাশে চারটি ডানামেলা পাথরের পরী, এত জীবন্ত, মনে হয় যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। পুকুরের রুপোলী মাছও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম।

ছেলেবেলায় অবশ্য ঠিক বুঝিনি, পরে যখনই সেই বাড়িটার কথা মনে পড়তো, তখন অনুভব করতাম, ঐ দেয়াল-ঘেরা স্থাবর বাড়িটার মালিক অন্যলোক, কিন্তু ওর যে সৌন্দর্য, আমিও তার মালিক। আমি অনায়াসে বলতে পারি, ঐ বাড়িটা আমার, কেন না আমি ওর দৃশ্যের মাধুরী উপভোগ করেছি। এইরকম ভাবে পৃথিবীর সব কিছুরই অধীশ্বর হওয়া যায়, বড়জোর দরকার একটা দূরবীন! অবশ্য, এসব কথা সব সময় মনে পড়ে না।

হোটেলের জানলার পাশে বসে সিগারেট টানতে টানতে কিন্তু আমার মনে পড়লো শিমুলতলার সেই বাড়িটার কথা। আমঝরিয়া ডাকবাংলো থেকে দেখা উপত্যকা, বালুরঘাটে দেখা একটা নিথর পুকুর, এইরকম টুকরো টুকরো আরও দৃশ্য, অর্থাৎ যাকে বলে পৃথিবী। এবং আমার প্রিয় ধারণা অনুযায়ী বলতে হচ্ছে, এই পৃথিবীটা আমার।

মনে হতেই একটু হাসলাম। আমি কে? আরে বাবা, আমি কে? প্রায় তো একটা নন-এনটিটি। আমার চেহারায়, নামে, জীবনযাত্রায় কোনো বিশেষত্ব নেই, আরও হাজার হাজার মানুষের মতন। হুবহু আমার মতন চেহারাই নাকি আর একজন লোক আছে। আর জ্যোতি রায়চৌধুরী নামে তো কলকাতাতেই অন্তত ডজন দুয়েক লোক পাওয়া যাবে।

প্রথম যখন সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলাম, কনফারমেশনের আগে পুলিশ রিপোর্টে দেখা গেল, আমি নাকি দু'বছর জেল খেটেছি! অথচ সিনেমায়

ছাড়া আমি কখনো সত্যি জেলখানা দেখি নি। পরে অবশ্য জানা গেল, একটু ঠিকানায় গোলমাল। বরানগরে আর একজন জ্যোতি রায়চৌধুরী আছে, সে দাগী আসামী। নিশ্চয়ই আর কোনো জ্যোতি রায়চৌধুরী আছে, ব্যর্থ প্রেমিক, ব্যবসায়ে ঝানু কোনো জ্যোতি রায়চৌধুরী থাকাও সম্ভব, এমন কি একজন টেনিস চ্যাম্পিয়নও থাকতে পারে।

তবে, নামে কি আসে যায়। কিচ্ছু না। নামে যে কিচ্ছু আসে যায় না, এ সম্পর্কে অনেক কবিতা এবং বাণী আছে। আর চেহারা? অসিত মজুমদারের যে আমার মতন চেহারা, সেটা কি হবে? চেহারায় কিছু আসে যায় না, এ সম্পর্কে কোনো মহাপুরুষের বাণী-টাণি নেই? ঠিক মনে পড়ছে না, তবে অ্যাসিসির সন্ত ফ্রান্সিস শরীরটাকে গাধা বলেছিলেন। ব্রাদার অ্যাস। অসিত মজুমদারকে আমি অনায়াসে ব্রাদার অ্যাস বলতে পারি।

যাই হোক, বার বার তবু মনে হচ্ছে এ পৃথিবীটা আমার। ভাবতে ভাবতেই পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে যেতে লাগলো, একেবারে একটা বিন্দু—আমি মনে মনে শুধু একটা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছি, সেই বিন্দুটাও ঘুরছে। তারপর বিন্দু আবার একটু বড় হলো, ঠিক মানুষের চোখের মণির মতন। কার চোখ? আর কিছু নেই, শুধু একটা চোখের মণি, আমি তীব্রভাবে তার দিকে চেয়ে আছি। এবার চিনতে পারলাম, এতো আজ ট্রেনে দেখা সেই মেয়েটির চোখ। যে মেয়েটি ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছিল। আমাকে নয়, অসিত মজুমদারের মতন দেখতে একজন লোককে।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কেন আজ আবার এতক্ষণ নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর মনে হচ্ছিল আমি বুঝতে পেরেছি। যে-যুক্তিতে আমি শিমুলতলার সেই দেয়াল-ঘেরা বাড়িটাকে আমার বলতে পারি, সেই যুক্তিতে আজ ঐ ট্রেনে দেখা ঐ সুন্দরী মেয়েটিও আমার। আপাতত সেই মেয়েটিই পৃথিবীর প্রতীক। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার। কে তুমি, কি তোমার নাম? তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার আবার দেখা হবে।

শঙ্করাচার্যের সেই আধখানা শ্লোক যেন কি? অহংকার করে সেই যে বলেছিলেন, কোটি কোটি বইতে যা লেখা হয়, তা আমি আধখানা শ্লোকে বলে দিতে পারি! 'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ'

—কি সেই অর্ধেক শ্লোক ? ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা—জগৎটা মিথ্যে ? যদি তাই হয়, তাহলে মিথ্যে কাল্পনিক দৃশ্যের মালিক হতে কে আমায় বাধা দিচ্ছে ! ট্রেনে দেখা সেই নারী, তুমিও অলীক ? তুমি আমার। ব্রহ্ম যদি সত্য হয়, তবে যতদিন বেঁচে আছি, আমিও সত্য। তুমি আমার—এ কথাও সত্য।

আবার একটু হাসি পেল। কেউ শুনলে ভাববে, আমি যেন, জীবনে আর কোনো মেয়েকে দেখিনি, কারুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, আমি যেন এই চৌত্রিশ বছরে আজই আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছি বেগমপুর স্টেশনে, এবং ট্রেনের জানালায় প্রথম একটি পৃথিবীর নারী দেখেছি। এবং সেই মেয়েকে দেখা মাত্রই পাগল হয়ে উঠেছি ! হুঁ, এ কি আদেখলাপনা আমার !

না, চৌত্রিশ বছর বয়েসে আমি আরও অন্যান্য মেয়েদের দেখেছি, মিশেছি, ভালোবেসেছি, দুঃখ পেয়েছি—এমন কি আজ ট্রেনে-দেখা মেয়েটির চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। কিন্তু ট্রেনে দেখা ঐ মেয়েটি আমার। হ্যাঁ, তুমি আমার। ট্রেনের জানলা দিয়ে তুমি ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। অসিত মজুমদারের দিকে নয়, আমারই দিকে—আমার এই রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যে যে প্রাণীর অধিষ্ঠান. তারই দিকে। আমি তোমার সেই মুখ চিরস্থায়ী করে রেখেছি। তুমি এখন আমার। বেশীদিন লুকিয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি দেখা দিও, নইলে আমাকে খুঁজতে বেরুতে হবে।

—স্যার, আপনি রাত্রে কি খাবেন ?

—অ্যাঁ ?

হোটেলের ম্যানেজার কখন ঘরে এসে ঢুকেছে খেয়ালই করি নি। লোকটি খুব রোগা ও লম্বা, জলদস্যুদের মতন বিরাট গোঁফ—মুখখানা নিষ্ঠুরের মতন, যদিও খুবই বিনীত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। হয়তো লোকটা সত্যিই নিষ্ঠুর নয়। মুখ দেখে মানুষের কিছুই বোঝা যায় না।

—ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় নক্ করে ঢুকবেন।

—কি বললেন, স্যার ?

—এরপর যখন আবার আসবেন, দরজায় নক্ করে তারপর আসবেন। আমি তাই পছন্দ করি। বেয়ারাদেরও সে কথা বলে দেবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। খুবই অন্যায়—তবে আপনার দরজা খোলাই ছিল।

—দরজা খোলা থাকলেও না ডেকে ঢোকা ঠিক নয়। যাক গে, আপনি কি বলতে এসেছেন?

—বলছিলুম, আপনি কি বাইরে খাবেন, না হোটেলে খাবেন? এখানে যদি খান, আগে থেকে অর্ডার না দিলে—

—হোটেলেই খাবো। খাবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আপনাদের রুম সার্ভিস আছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপরে পাঠিয়ে দেব! কি খাবেন?

—কি খাবো? মানুষ যা খায় তাই খাবো।

জলদস্যুর মতন বিরাট গোঁফ সমেত মুখখানা দিয়ে লোকটি বিস্ফারিত-ভাবে আমার দিকে তাকালো। আহা, লোকটা কি অসহায় হোটেলের ম্যানেজারি করার জন্য ওকে কত লোকের অভদ্র ব্যবহার হাসি-মুখে সইতে হয়। নাকি ও-ই হোটেলের মালিক? তাহলে তো চাকরি ছাড়ারও উপায় নেই—সারাজীবনই লোকের সামনে এরকম বিগলিত মুখে হাসতে হবে। এর চেয়ে, ওরকম চেহারা নিয়ে ও যদি সত্যিই জলদস্যু হতো, তা হলে কিরকম মানাতো।

লোকটি বললো, না, জিজ্ঞেস করছিলাম কি, রাইস খাবেন না রুটি? ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান।

—কি কি পাওয়া যাবে?

—মেনু নিয়ে আসবো?

—না, মুখে বলুন।

—ফিস কারি হবে, রুই আর ভেটকি, মটন, চিকেন।

—বেগুন ভাজা পাওয়া যাবে?

—লোকটি এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। বললো, এমনিতে হয় না, যদি আপনি অডার দেন, তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে।

—ঠিক আছে, কি খাবো, আমি একটু ভেবে দেখছি। আপনি আধঘণ্টা পরে আসবেন। আর শুনুন, আমাকে, মানে অসিত মজুমদারের কেউ যদি খোঁজ করে, বলবেন, আমি এখন ঘরে নেই, কাল সকালে দেখা হবে।

—আচ্ছা স্যার, আমি তা হলে আধঘণ্টা পরে আসবো।

—যাবার সময় দয়া করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাবেন।

লোকটির সঙ্গে ইচ্ছে করে আমি অভদ্র ব্যবহার করছিলাম কেন? অপ্রয়োজনীয় ভাবে রূঢ় ভঙ্গিতে কথা বলে আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম। অথচ, আমার স্বভাব তো এরকম নয়। সাধারণত আমি কম কথা বলি, কিন্তু লোককে অপমান করতে চাই না। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে রূঢ় কথা কিংবা ধমকে কথা বলা দরকার, সেখানেও পারি না।

আমি যে এই হোটেলে উঠেছি, তা এখন পর্যন্ত আর কেউ জানে না—আমাকে এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না। আর অসিত মজুমদারের নাম করে খুঁজতে আসা তো একটা অসম্ভব, অবাস্তব ব্যাপার। তবু ও কথা ম্যানেজারকে বললাম কেন? যাই হোক, বলে কিন্তু বেশ মজাই পাচ্ছি! আজ আমার মন ভালো আছে, আজ আমি যা-খুশী করতে পারি।

কি খাবো, সেটা বলার জন্য আধঘণ্টা সময় নিলাম কেন? একটা যা-হোক কিছু বলে দিলেই তো হতো। হোটেলের বিল অফিস থেকে দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করারও কিছু নেই। মুর্গীর মাংস বা পাঁঠার মাংস—কোনোটার প্রতিই আমার বেশী ভালবাসা নেই। কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রতিই তেমন আকর্ষণ নেই—একটা কিছু খেলেই হয়। তবে আধঘণ্টা কিসের জন্য!

আসলে আমি আজ অসিত মজুমদারের মতন খাবার খেতে চাই। কি খেতে সে ভালোবাসে? রাত্তিরে সে ভাত খায়, না রুটি? পাঁউরুটির চেয়ে হাতে গড়া রুটি তার বেশী প্রিয়? নাকি লুচি-পরোটা না হলে সে মুখেই তুলতে পারে না? পরোটা জিনিসটা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, আজ পরোটাই খাবো ঠিক করলুম। পরোটা আর মুর্গীর রোস্ট। আমি ঝাল খাই না, আজ বেশী করে ঝাল দিতে বলবো, আর এক প্লেট টক দই। অসিত মজুমদার লোকটা বোধ হয় খুব রাগী, তার কথা ভেবেই আমি ম্যানেজারকে ওরকমভাবে ধমকাচ্ছিলুম।

কিংবা যদি সে রাগী না হয়? হয়তো একেবারেই মাটির মানুষ। মানুষের সঙ্গে সব সময় খুব সহৃদয় ব্যবহার করে। তা হলে কি আমার ভুল ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে? ঐরকম একটি মেয়ে যে-লোককে ভালোবাসে, সে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারে? ট্রেনের জানলার মেয়েটি কি সত্যিই অসিত মজুমদারের প্রেমিকা? যাক গে, ব্যস্ততার কিছু নেই। জানতে ঠিক পারবোই।

দরজায় খট খট শব্দ হলো। মাত্র সাত মিনিট হয়েছে, এর মধ্যেই ম্যানেজার আবার এসেছে? এবার ওকে ধমকাতেই হবে। এবার ধমক ওর প্রাপ্য।

বেশ ঝাঁঝালো মেজাজ নিয়ে দরজা খুললুম। ম্যানেজার নয়, একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, খুবই মলিন চেহারা। কি চাই ছেলেটি বললো, আমার ঘরের কুঁজোতে সে জল ভরে দেবে।

আবার ফিরে এসে বারান্দার কাছে চেয়ারে বসলুম। ছেলেটা কুঁজো নিয়ে গেছে কিন্তু ফিরতে বেশ দেরী করছে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, ছেলেটির জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি। আশ্চর্য তো, ঐ ছেলেটার কথা আমার মনে জায়গা জুড়ে আছে কেন? ও যখন হোক আসবে, জল রেখে চলে যাবে—এতে আমার চিন্তার কি আছে? হয়তো অধীরতার কারণ এই, ছেলেটি কুঁজো রেখে গেলে, আবার উঠে দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো, সেই জন্য অপেক্ষা করছি। ছেলেটি আসছে না। আবার দরজার কাছে গিয়ে ছেলেটির জন্য উঁকি মেরে দেখলাম।

এসব কোনোটাই আমার স্বভাব নয়। প্রায়ই অফিসের কাজে আমাকে নানা জায়গায় হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়, হোটেলের ম্যানেজার কিংবা বেয়ারা-টেয়ারাদের লক্ষ্যই করি না। কিন্তু এবার একটা তফাত আছে। এবার আমি হোটেলের খাতায় অসিত মজুমদার হিসেবে নাম সই করেছি। যা হচ্ছে হোক, যা ইচ্ছে হয় তাই করেই দেখা যাক না। আমি এখন এই আসানসোলের হোটেলে আর জ্যোতি রায়চৌধুরী নই, আমি অসিত মজুমদার— এটা ভাবতে খুব ভালো লাগছে। যেন আমি নিজের কাছ থেকে ছুটি পেয়েছি।

আঃ, ছুটি! লোকে আমার কাছ থেকে যে-রকম ব্যবহার আশা করে আমাকে অনবরত সেই রকম ব্যবহারই করতে হয়। কিন্তু আমি যদি ছুটি নিয়ে কিছুদিন অন্য মানুষ হয়ে যাই, তা হলে আমি কি রকম ব্যবহার করবো—তা তো কেউ আগে থেকে বুঝতে পারবে না!

—কি এত দেরী হলো যে?

ছেলেটি বেশ অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, আপনি জল খাবেন?

—না। জল চাই না। কিন্তু তোমার এত দেরী হলো কেন?

ছেলেটি আর উত্তর দিল না। যে-প্রশ্ন সে বুঝতে পারছে না, তার

উত্তর দেবে কি! কুঁজোটা নামিয়ে রেখে সে ঘরটা ঝাড় দিতে লাগলো। আমি ওকে লক্ষ্য করছি। আমি আর অন্য কোন দিকে মনোযোগ ফেরাতে পারছি না। এটা অস্বাভাবিক। তবে, যা চলছে চলুক।

—তোমার নাম কি?

—আঁজ্ঞে?

—তোমার নাম কি?

—বেচু।

—বেচু কি?

—বেচু লস্কর।

—কতদিন চাকরি করছো এখানে?

—তিন চার বছর।

কত মাইনে পাও?

—ষোলো টাকা।

—কত?

ছেলেটি চুপ। ঝাঁটা হাতে সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে সে অনিচ্ছুকভাবে। আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, আমি ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজারটা খুব চশমখোর তো, মাত্র ষোলো টাকা মাইনে দেয়! একটা ইউনিফর্ম'ও কিনে দিতে পারে নি? হোটেলের বেয়ারা হিসেবে এক প্রস্থ পোষাক ওর পাওনা নয়? একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে কাজ করছে, এত বড় হোটেল—

ছেলেটাকে একটা জামা কিনে দেবো আমি? একটু আগে ম্যানেজারের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, এখন এর সঙ্গে আশাতিরিক্ত সদয় ব্যবহার করে দেখলে হয়, কোনটা বেশী ভালো লাগে! হোটেলের নীচেই এক গাদা কাপড়ের দোকান দেখেছি। একটা ছিটের জামার দাম কত আর হবে, দশ বারো টাকা। দেখাই যাক্ না, ওকে একটা জামা কিনে দিলে কি রকম লাগে। ওর না, আমার। ওর হাতে টাকা দিলে কি আর জামা কিনবে? ওর নিশ্চয়ই একটা অক্ষম বুভুক্ষু বাবা আছে, সে কেড়ে নেবে। আমার নিজে সঙ্গে গিয়ে জামাটা কিনে দেওয়া উচিত। চটি পায়ে গলিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম পর্যন্ত।

কিন্তু এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি নয়? হঠাৎ এরকম নাটকীয়ভাবে

দয়ালু হয়ে ওঠা···আমার নিজেরই তো লজ্জা করবে। অসিত মজুমদার কি খুব ইমোশোনাল নাকি? ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামবো. তারপর দোকানে জামা বাছাবাছি হবে, এতক্ষণ পর্যন্ত কি আমার এই ইমোশন টিঁকবে? এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব।

আবার চটি খুলে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি ছেলেটাকে ঠকাচ্ছি। একটু আগে আমি ওকে একটা নতুন জামা দিয়ে দিয়েছিলাম, এখন যেন সেটা আবার ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে অনুযায়ী, একটু আগে তো ওকে আমি একটা নতুন জামা দিয়েই দিয়েছিলাম। এখন সেটা থেকে ওকে বঞ্চিত করা কি উচিত? না, উচিত নয়। একদিন না হয় চরিত্র বিরোধী একটা নাটকীয় কাজ করলুম।

আবার উঠে আমি বললাম. বেচু, আমার সঙ্গে একটু নীচে চলো।

—কিছু আনতে হবে?

—না, এমনিই আমার সঙ্গে চলো।

ছেলেটি ভয় পেয়েছে, যেতে চায় না। তা তিনবার এমনি বলার পর রাজী হলো না দেখে ওকে জামা কেনার কথাটা বললাম। তা-ও ও নেবে না। ও বললো. এখন গেঞ্জি পরে আছে বটে. কিন্তু ওর একটা জামাও আছে।

আমি দু'দিনের জন্য আসানসোলে এসেছি, আমার সুটকেসে পাঁচখানা জামা।

ভয় পাচ্ছে কেন ছেলেটা? ওঃ হো, ও বোধহয় আমাকে বালক প্রেমিক ভেবেছে। হোটেলে বেয়ারার কাজ করছে. নিশ্চয়ই ওর সে অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আমার চেহারা দেখে কি আমাকে বালক-প্রেমিক মনে হয়? অবশ্য চেহারা দেখে মানুষকে কিছুই বোঝা যায় না।

এক ধমক দিয়ে বললাম, চল্ আমার সঙ্গে। ময়লা গেঞ্জি পরা চেহারা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাবো না, এই দশটা টাকা নে. এক্ষুণি একটা জামা কিনে নিয়ে আয়। আমাকে দেখিয়ে যাবি। আর কারুকে বলবি না. কে টাকা দিয়েছে। যা, এক্ষুণি যা।

কুঁজোয় জল ভরে আনতে যতটা সময় লেগেছিল, তার অনেক কম সময়ে ছেলেটা একটা জামা কিনে আনলো। দোকান থেকেই গায় দিয়ে

এসেছে। এখন আর ভয়ের ভাব নেই, মেয়েদের মতন হাসি তুলেছে ঠোঁটের পাশে।

কিন্তু এখন আমি ছেলেটির দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারছি না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে নিজের কাণ্ডতে। হঠাৎ দরদ উথলে উঠলো, ফস করে একটা জামা কিনে দেওয়া—এর মধ্যে একটা কি রকম যেন হামবড়াই ভাব আছে। অন্য কারুকে এরকম কিছু করতে দেখলে আমি হাসতাম। আর আমি নিজেই—থাক্ গে, এটা অসিত মজুমদারের ব্যাপার বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। জ্যোতি রায়চৌধুরী কখনো এরকম করতো না।

ছেলেটা ঘর ঝাড় দিচ্ছে আবার, আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি না। ও মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমাকে কিছু বলতে চায়—কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না আমার কাছ থেকে। আমি একেবারে পিঠ ফিরিয়েই বসলাম। যা রুচি ছেলেটার. একটা ক্যাটকেটে হলুদে রঙের জামা কিনেছে!

॥ ৩ ॥

আসানসোল শহরে আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না। কালাপাহাড়ীতে কয়লা খনির এজেন্ট মিঃ পি. এন. নাগের সঙ্গে দেখা করাটাই আমার এখানে একমাত্র কাজ। পি. এন নাগের পুরো নামটা কি তাও আমি জানি না, অফিসের সূত্রে পরিচয়. সুতরাং মিঃ নাগ বলেই সব সময় ডাকতে হয়। উনিও আমাকে মিঃ রায়চৌধুরী বলেন. আমার পুরো নাম ওঁর জানার কোনোই প্রয়োজন হয়নি। উঁচু পোস্টে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নাম ধরে অমুকবাবু বলে ডাকার রেওয়াজ নেই। মিঃ নাগ আবার খুবই সাহেব, কোটের তলায় ওয়েস্ট কোট পরতে এরকম আজকাল খুব কম লোককেই দেখা যায়। এই গরমেও। অবশ্য, মিঃ নাগ একদিন ওঁর কোয়ার্টারে আমাকে সন্ধ্যেবেলা চায়ে ডেকেছিলেন, সেদিন ওঁর ওখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড শুনেছি. সেটাও সাহেবী কায়দার অন্তর্গত।

মিঃ নাগের কাছে একদিন যেতে হবে নিজের পরিচয়ে।

মনীশকাকাদের বাড়িতেও একবার অন্তত না গেলে চলবে না। ডাঃ মনীশ সরকার এখানে বহুদিনকার ডাক্তার. আমার বাবার বন্ধু ছিলেন

—ছিলেন বললাম এই জন্য যে, ডাঃ মনীশ সরকার এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু আমার বাবা মারা গেছেন। হয়তো, আমার বলা উচিত ছিল, আমার বাবা ছিলেন ওঁর বন্ধু। সেইরকম, মনীশকাকার ছেলে হিমানীশ ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু. বন্ধুত্ব এখনো আছে, কিন্তু হিমানীশ বেঁচে নেই. আমি বেঁচে আছি।

হিমানীশের সঙ্গে স্কুল কলেজে বরাবর এক সঙ্গে পড়েছি, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছিলাম বলে হিমানীশ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ডাক্তারি না করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো, পাশ করার মাত্র একটি বছর পরেই রাঁচীর হুড্রুতে চান করতে গিয়ে আচমকা পা পিছলে জলের ধাক্কায় ভেসে গেল হিমানীশ, খানিক দূরে গিয়ে যে পাথরটা আঁকড়ে ধরেছিল সেই পাথরটাই ওকে মারলো! হিমানীশ বেঁচে থাকলেও নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সার্থক হতে পারতো না, আত্মরক্ষা সম্পর্কে এত কম সচেতন ছিল। বরং ডাক্তার হলে অন্য অনেকের প্রাণ বাঁচাতে পারতো।

যাই হোক, মনীশকাকা, তাঁর স্ত্রী, আর মেয়েরা আমাকে ওদের বাড়ির লোকের মতই মনে করে। আসানসোল এসে আমাকে ওদের বাড়িতেই উঠতে হয়, এর আগের তিনবার তাই উঠেছি। এবার হোটেলে ওঠা সম্পর্কে একটা কিছু গুরুতর অজুহাত বানাতে হবে। তবে, একবার যেতেই হবে ওদের বাড়ি, নইলে রাস্তাঘাটে হঠাৎ যদি ওরা কেউ দেখে ফেলে—তা হলে বড্ড মনে আঘাত পাবে।

এই দু'জায়গায় আমি জ্যোতি রায়চৌধুরী। আমার ব্যবহার, কথা বলার ধরন—এই দু' জায়গায় শুধু পরিচিত। এ ছাড়া, এই শহরে বাকি সময়টায় আমি অন্য একজন নতুন মানুষ হয়ে যেতে পারি অনায়াসে। অসিত মজুমদার হলেই বা ক্ষতি কি ?

আচ্ছা, অসিত কথাটার মানে কি ? এই নামটা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কখনো মানে জানবার কথা খেয়াল হয়নি। বাংলা অভিধান এখানে কোথায় পাবো ! হোটেলে তো আর চাওয়া যায় না ! মিঃ পি. এন. নাগের সঙ্গে জরুরী অফিস সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করি, বাই দা ওয়ে, আপনার কাছে বাংলা টু বাংলা অভিধান আছে ? ওঁর কাছে নিশ্চয়ই স্যাক্রিলিজ মনে হবে !

তিনদিন থাকবো আসানসোলে। ইচ্ছে হলে অফিসে ট্রাংককল করে

জানিয়ে আরও বেশী দিন থাকতে পারি। বার্নপুর, ঝরিয়া, সিন্ধ্রিতেও অনায়াসেই অফিসের কাজ বানিয়ে নেওয়া যায়। সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে তো! ট্রেনের জানলায় দেখা সেই মেয়েটি। কোথায় নেমেছিল ওরা? আসানসোলে আমি ওদের কম্পার্টমেণ্ট ফাঁকা দেখেছি, এর আগে কোথাও নেমে যাওয়া সম্ভব? যাক, ব্যস্ততার কিছু নেই, দেখা হবেই।

কি নাম হতে পারে মেয়েটির? পরমা নাম হলে কেমন হয়! পরমাসুন্দরী থেকে পরমা। কিংবা সব ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী যেমন শ্রেষ্ঠ ছন্দ। সংযুক্তা কিংবা সঙ্ঘমিত্রা ধরনের একটু রেয়ার নাম হতে পারে?

না, মেয়েটির নাম রাখলুম আমি মায়া। একটু সাদামাটা, পুরোনো ধরনের নাম, এখনকার যুবতী মেয়েদের এই নাম পছন্দ নয়, তবু আমি মায়াই রাখলুম। আহা, অসিত নামটাই বা কি এমন আধুনিক। সিনেমার অসিতবরণ কবে বুড়ো হয়ে গেছে! অসিত মজুমদারের প্রেমিকার নাম আবার মায়া ছাড়া কি হবে।

মায়া নামটাই আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমং নু কস্তং তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ! তুমি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম; না আমার তাবৎ পুণ্য ফলে তুমি এসেছো? কতটা পুণ্য আমার নামে জমা হয়েছে? জানি না, পুণ্য কিসে জমা হয়, কিন্তু পাপ তো কিছু করিনি! মায়া, তুমি দেখো, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরেও আমি কোনো পাপ করবো না।

—মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি ট্যাক্সিটা ছাড়বেন না!

—না, ছাড়িনি, আমি ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি।

—ভালোই হলো, আমার একজন লোক জরুরী দরকারে টাউনে যাবে। টেলিফোনে ট্যাক্সি পেতে এত দেরি! আমি একজনকে টেলিফোন করেছি, সে এলে আপনার জন্য ওয়েট করবে। আমার লোক এটায় চলে যাক্—আমার জিপটার ব্রেকে একটু ট্রাবল দিচ্ছে—

—না, তার দরকার নেই! এই ট্যাক্সিটাই আপনার লোককে শহরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে আবার। আপনি যাকে টেলিফোন করেছেন, তাকে বারণ করে দিন!

—না না, এ আবার উল্টে ফিরে আসবে কেন?

—আমি ওকে সারা দিনের জন্য ভাড়া করেছি।

—সারা দিনের জন্য ?

মিঃ নাগকে আর কোন উত্তর না দিয়ে আমি একটু হাসলাম। ছোট্ট শহর আসানসোল, এখানে সারা দিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া একটা উদ্ভট ব্যাপার। কিন্তু আমার যে হঠাৎ ঐ রকম উদ্ভট খেয়াল হয়েছে, সেটা উনি বুঝবেন কি করে !

লোকাল ট্রেনে আসানসোল থেকে কালীপাহাড়ী আসতে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে। তবে স্টেশন থেকে মিঃ নাগের অফিসে আসতে হলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। তাছাড়া, অফিসের কাজে এলে এই পথটা ট্রেনে যাতায়াত করা কেতা-দুরস্ত ব্যাপার নয়। ঝট করে এসে ট্যাক্সি থামবে, তোমার ঠোঁটে কায়দা করে ঝুলিয়ে রাখবে সিগারেট, তোমার মানিব্যাগে থাকবে থরে থরে দশ টাকার নোট, তার থেকে গোটা দুয়েক বার করে দিয়ে খুচরো ফেরৎ নেবে না, তাহলে বোঝা যাবে তুমি ভালো কম্পানির ভালো মাইনের লোক।

আগে দু'বার আমিও তাই করেছি। এবারও যে আমাকে সেই রকমই করতে হবে, তার কি মানে আছে ? ভেবে চিন্তে কিছুই করিনি। আগের দু'বার দেখেছি যে আসার সময় কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু ফেরার সময় ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন করেও বসে থাকতে হয় বহুক্ষণ। এই খনি এলাকায় টেলিফোনেই সব কাজ সারতে হয়।

আমি এবার ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঘণ্টা দু'এক বাদে সে আমাকে আবার এসে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কেননা, শুধু ট্যাক্সি আসতে দেরী হচ্ছে বলেই মিঃ নাগের সঙ্গে কথা ফুরিয়ে যাবার পরও কথা বলতে হয়। ট্যাক্সিওয়ালা বললো, যদি তখন সওয়ারি না থাকে তাহলে আসবো। যদি বার্নপুরের প্যাসেঞ্জার পাই, তাহলে সেটা ছেড়ে তো আর এদিকে আসবো না।

ঠিক কথাই বলেছিল সে। কিন্তু তার কথা বলার মধ্যে একটু অবজ্ঞার ভঙ্গি ছিল। কি একটা অজ্ঞাত কারণে সে কালীপাহাড়ীর চেয়ে বার্নপুরের সওয়ারিদের বেশী সম্মান দেয়। চট করে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। কণ্ঠস্বর শান্ত রেখেই আমি জিজ্ঞেস করলাম। তোমাকে যদি কেউ সারাদিনের জন্য বুক করে তাহলে কত লাগে ?

সে আরও অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, হোল ডে মানে ক' ঘণ্টা।

—এই ধর, আট ঘণ্টা !

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন সে বললো, সত্তর টাকার কম নয়। কেন যে সে আশী টাকা বা একশো টাকা বললো না, তা সেই জানে। আমি তাকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে তিরিশটা টাকা আছে !

সে ঘাড় না ফিরিয়েই বললো, তিরিশ টাকা ?

ততক্ষণে আমি একশো টাকার লম্বা নোটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি। তার মুখে ভ্যাবাচাকা ভাব ঢাকার অক্ষম চেষ্টা। আমি হাসিমুখে বললাম, এখন থেকে আট ঘণ্টার জন্য আমি এটা নিলাম। এখন ঠিক দুটো দশ, দশটা দশে তোমার ছুটি।

তখন ট্যাক্সিওয়ালার মুখের চেহারাটা দেখবার মতন। সে সমূলে ঘুরে গোল গোল চোখে তাকালো আমার দিকে। কিছু একটা বলতে চায়। আমি অবশ্য ওকে আর পাত্তা দিলাম না, ব্রিফ কেস খুলে জরুরি কাগজ পত্রে চোখ এঁটে ব্যস্ত মুখ করে বসে রইলাম।

আঃ, মনটা বেশ ভালো লাগছে।—আগে কখনো আমি এমন বেপরোয়া হইনি। টাকা পয়সার মূল্য আমি জানি, কম্পানির খরচে বাইরে এসে দু' চার টাকা বাঁচাবারও চেষ্টা করি প্রত্যেকবার। কিন্তু এবার আমি স্বাধীন। যখন যা ইচ্ছে হচ্ছে করে যাবো। অবশ্য এটাকে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু আমি তো পাগলামি করছি না, আমার মতন আর একজন লোক এই রকম ব্যবহার করলেও করতে পারতো—এই ভেবে। সঙ্গে টাকাকড়ি খুব বেশী নেই, তিন দিনের হিসেবে সাড়ে চারশো টাকা এনেছি অফিস থেকে, এইরকম ভাবে চললে দেড়দিনেই ফতুর হয়ে যাবে। দেখাই যাক না !

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না, নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে ? বাইরে থেকে নিজেকে দেখতে। ইচ্ছে করে না, আমি একটা অন্য মানুষ হয়ে যাই ? আমি আজ অন্য মানুষ, আমার প্রেমিকার নাম মায়া।

…মিঃ নাগ, আপনার সিগারের ফ্লেভার তো খুব সুন্দর !

—এটা ফিলিপিনসের - উড ইয়ু লাইক টু ট্রাই ওয়ান ?

—আপনার কাছে এক্সট্রা আছে ? দিন একটা !

যে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে। মিঃ নাগও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন। প্রতিবার এখানে আসবার সময় পাঁচ শো পঞ্চান্ন নম্বর সিগারেটের বড় প্যাকেট নিয়ে আসি। আমি আসি আমাদের কোম্পানির জিনিস মিঃ

নাগকে বিক্রী করার জন্য। ওঁকে একটু খাতির করা আমার আচার ব্যবহারের অঙ্গ। মিঃ নাগ সাধারণত চুরুট খান, কিন্তু চুরুট আনা যায় না—কারণ আমি নিজে চুরুট খেতে পারি না। কারুকে কোনো কিছু অফার করে নিজে সেটা না-খাওয়া অভদ্রতা। মিঃ নাগ অবশ্য ভালো সিগারেট পেলে তখন চুরুট রেখে অনিচ্ছার সঙ্গে দু'একটা খেয়ে দেখেন, আমি ধন্য হয়ে যাই। যদিও, নিজে না খেয়েও স্কচের বোতল উপহার হিসেবে দেওয়া যায়, কম্পানিই সেটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

এবার সিগারেট আনিনি, বরং নিজেই মিঃ নাগের চুরুট চেয়ে নিলাম। নাঃ, বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কম্পানির কাজটা ঠিক মতন করতে হবে, চাকরিটা হারালে চলবে না। মিঃ নাগের অফিসের সিঁড়িতে পা দিয়ে আমি মনে মনে বললাম, অসিত মজুমদার এবার যাও, এখন আমি পুরোপুরি জ্যোতি রায়চৌধুরী। অসিত মজুমদার কি রকম কাজকর্ম করে সে সম্পর্কে তো আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু আমার নিজের কাজ জানি।

অফিস ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ব্রিফ কেসটা রেখে, চেয়ারে বসে আমি সচেতন হয়ে গেলাম। এখন আর ছুটি নয়, এখন কাজ। এখন আর নিজের সত্তা থেকে বাইরে এসে অন্য মানুষ হিসেবে খেলা করা যাবে না। এখন আমি একটা কম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মাত্র, কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্ট বিক্রির ব্যাপারে নেগোসিয়েশান করতে এসেছি।

পুরো দেড় ঘণ্টা মিঃ নাগের সঙ্গে কাজে ডুবে রইলাম। মিঃ নাগ খুবই দক্ষ লোক, আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট করেন না, কাজ আদায় করে নিতে জানেন। কম্পানির কাছ থেকে সে সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন, তা পুরো উসুল করে দিচ্ছেন। ওঁর অধীনে পাঁচটা খনি, এর যাবতীয় খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে। মিঃ নাগ এমনভাবে কথা বলেন, যেন মনে হয়, খনিগুলোর মালিকও উনি। কথায় কথায় বলেন, মাই স্টাফ, মাই মেন, মাই কম্পানি—অবশ্য এরকমভাবেই সবাই বলে, বড় সাহেবদের এরকমভাবেই বলতে হয়। আসলে উনি শুধু বড় সাহেবই, খনিগুলোর পাঞ্জাবী মালিক কলকাতা ও দিল্লিতে বদলাবদলি করে সময় কাটান, তাঁর লাভের মোটা অঙ্ক মিঃ নাগ প্রতি মাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন।

কাজ শেষ হবার পর মিঃ নাগ বললেন, আপনার ট্যাক্সি ফিরে এসে আবার দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।

আমি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বললাম ও থাক, আমি একটু খনি দেখবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।
—ইয়ু মীন, আপনি অ্যাকচুয়ালি খাদে নামবেন?
—হ্যাঁ।
অবাক হবারই কথা। এর আগে দু'বার এসেছি, কখনো খনির মধ্যে নামতে চাইনি। কাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ও তো হাল্কা ভ্রমণকারীরা এসে খনিতে নামার শখ প্রকাশ করে। কিংবা বাচ্চারা বা মেয়েরা, কাজের লোকের পক্ষে ওসব ছেলেমানুষী মানায় না। কিন্তু জ্যোতি রায়চৌধুরী তার কম্পানির কাজ সার্থকভাবে শেষ করেছে, এখন একটু ছেলেমানুষী করে সময় কাটানো কি তার প্রাপ্য নয়? এখন তার ছুটি, এখন সে অন্য মানুষ হতে চাইলে, কার কি? আগের বার এসে সে যা করেনি, এবার ঠিক তাই করবে। এবার সে ছুটিতে বেড়াতে-আসা মানুষের মতন খনি দেখতে নামবে।
মিঃ নাগ কাজের লোক, তাঁর ম্যানেজারও ব্যস্ত, একজন ওভারসীয়ারকে দেওয়া হলো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে। মিঃ নাগ ভদ্রতা করে আমাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। আমার মাথায় আলো-জ্বলা লোহার টুপি, কোমরে মোটা বেল্টে বাঁধা ব্যাটারি।
আগে লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম, বেশ কয়েকজন কুলি কামিনের গায় নতুন খাঁকি পোষাক। একেবারে নতুন। শুকনো বিবর্ণ মানুষগুলোর গায়ে ঐ নতুন পোষাক রীতিমতন বিকট বেমানান লাগছে। দেখে চুপ করে থাকা যায় না। মিঃ নাগকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি লেবারদের পোষাক দিচ্ছেন নাকি এখন থেকে?
উনি ভুল বুঝলেন আমাকে। ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, কেন, জামা বানাবার অর্ডারের টেন্ডার দেবে, এমন কোনো বন্ধুটন্ধু আছে নাকি আপনার? থাকে তো বলুন!
আমি ম্লান হেসে বললুম, না, আমার কাছে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বেশ বেমানান লাগছে।
—কেন, বেমানান কেন? আপনি আমি পোষাক পরতে পারি, আর ওরা পারে না? নিউ ক্যাসল-এ দেখেছি—
মিঃ নাগের সঙ্গে তর্ক করা বিপজ্জনক। এটা রীতিও নয়। উনি বিমুখ হলে আমাদের কোম্পানির পৌনে তিন লাখ টাকার অর্ডারটা ক্যানসেল

করে দিতে পারেন। অফিসের কাজ ছাড়াও অন্য প্রসঙ্গ উঠলে, ওঁকে প্রচ্ছন্ন স্তুতি করে যাওয়াই নিয়ম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর কথায় সায় দেওয়া।
কিন্তু এতক্ষণ অফিস ঘরে আমরা দু'জনে ছিলাম দুটি কোম্পানির প্রতিনিধি, এখন এই আকাশের নীচে দু'জনে শুধু দু'টি মানুষ হতে পারি না ? আমি কি বলতে পারি না, আগে ওদের নিজের মতনই মানুষ মনে করা দরকার, তারপর পোষাক-টোষাকের কথা। মাঝে মাঝে দু' চারটে টাকা মাইনে বাড়ানো কিংবা দু' এক প্রস্থ পোষাক দেওয়া কিংবা প্যাঁচে পড়ে কোয়ার্টার বানিয়ে দেওয়া—এগুলো আরও অসহ্য, আরও অপমানের। আপনার বাড়িতে চারজন চাকর হিসেবে খাটছে, তাদের কুলি হিসেবে খাতায় নাম লেখানো। আপনার শোবার ঘরের খাটের তলায় একটা ইঁদুর মরে দুর্গন্ধ হয়েছিল, একজন শ্রমিককে ডেকে সেটা সাফ করান নি ?

কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম।
মিঃ নাগই বললেন, কোল কমিশন থেকে স্যাম্পেল সার্ভে করতে আসছে আমার এখানে। তাই একটু ফেস লিফটিং ! সবই ফার্স বুঝলেন না, এদেশের কিছু হবে না !

তাও কিছুই বললাম না। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলাম। আমার আর কি দরকার। এসব শ্রমিকদের কথা ভাববার জন্য রাজনৈতিক দল আছে। এক দল আর এক দলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে শ্রমিকদের—এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। ভালোবাসার প্রতিযোগিতা। আমার মতন উটকো লোকের হঠাৎ সহানুভূতি উথলে ওঠার কোনো মানেই হয় না।

লিফটে শোঁ শোঁ করে অন্ধকারে নামতে লাগলাম। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে লিফটের মধ্যে। বেশ গাঢ় অন্ধকার হতে অনেকটা সময় গেলো। বার বার মনে পড়তে লাগলো একটা লাইন, 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম।' ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম। হে মায়াবী মানুষ, নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছো সারা পৃথিবীতে, প্রত্যেক মানুষের কাছে তোমার আলাদা আলাদা পরিচয়, সেই অনুযায়ী তোমাকে বেঁচে থাকতে হয়। একবার বাড়ি ফিরে এসে বলো তুমি কে ?

যে ওভারসীয়ার ভদ্রলোক আমার পাশে ছিলেন, তিনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর আগে কখনো খাদে নেমেছেন ?
—না।
—দেখবেন, আপনার ভালো লাগবে।
—আমার ভালো লাগবে, আপনি আগে থেকেই বুঝতে পারছেন ? আপনি তো জানেন না, আমার রুচি কিরকম, কোনটা আমার ভালো লাগে না-লাগে ? শুনেছি তো, অনেকের নাকি খনির মধ্যে নামলে একটা দম আটকে আসা ভাব হয়—
—তা হয়। অনেকের দম আটকে আসে, অনেকে সর্বক্ষণ মনে করে এই বুঝি কোনো জায়গাটা ভেঙে পড়ে পথ আটকে গেল, বড় ধেমোর মতন একটা কিছু কাণ্ড হয়ে গেল। এইরকম ভয়ে অনেকে তাড়াতাড়ি ওপরে ফিরে যেতে চায়, অনেকে আবার এই ভয়টাই উপভোগ করে।
—আমিও কি উপভোগ করবো, না বেশী ভয় পাবো ?
—আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি উপভোগই করবেন। আপনি একটু কম কথা বলেন—যারা বেশী বকবক করে তারাই ভীতু হয়।
অন্ধকারে পরস্পরকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না। তবু ভদ্রলোককে আবার ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হলো। অন্ধকারের মধ্যেও আমাকে দেখে কিরকম মনে হয়, এই প্রথম অন্য মানুষের মুখে সে-কথা শুনলাম।

॥ ৪ ॥

—মায়া, আমাকে চিনতে পারলে না ? মায়া, আমাকে চিনতে পারলে না ?
—কে আপনি ?
—চিনতে পারলে না ? ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি সেই মানুষ, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো। তোমার জন্যই বার বার মানুষ জন্ম নিয়েছি। বার বার অমানুষ হতে গিয়েও, শুধু তোমারই জন্য, আবার মানুষ হয়ে যাচ্ছি। ভালো করে চেয়ে দ্যাখো।
—না, আপনাকে চিনতে পারছি না।
—আরো ভালো করে তাকাও। শুধু মুখ বা শরীর দেখো না, একেবারে

ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখো, যেখানে মানুষের বাস।

—মাপ করুন, আমি এখন ব্যস্ত আছি!

বলাই বাহুল্য, এই কথাগুলি হচ্ছিল আমার মনে মনে। প্রকাশ্যে, জোরে জোরে কি আর কেউ এরকম কথা বলে? তা হলে ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।

জানতাম, ট্রেনের জানলায় সেই মেয়েটি, যার নাম আমি রেখেছি মায়া, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। কিন্তু এত শিগগিরই যে দেখা হবে, তা বুঝতে পারি নি। সেই দু'টি মেয়ে ও দু'টি ছেলে দল বেঁধে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ট্রেনের জানলায় অবশ্য ওদের পাঁচজন দেখেছিলাম, একটি মেয়ে এখন ওদের সঙ্গে নেই। তা না থাক, মায়া তো আছে। ওরা তাহলে আসানসোলেই নেমেছে! আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। আসানসোলে ওরা না-নামলেও এমন কিছু ক্ষতি হতো না অবশ্য, আমাকে একটু বেশী খুঁজতে হতো, এই যা। দেখা ঠিক হতোই মায়ার সঙ্গে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায়।

ওরা কেউ আমাকে দেখতে পায় নি—কারণ ওরা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে, আপন মনে গল্প করতে করতে—আর আমি যাচ্ছিলাম ট্যাক্সিতে। ওরা আমার ট্যাক্সির দিকে তাকায় নি, আর আমি দেখেছি, চলন্ত ট্যাক্সি থেকে যে-টুকু সময় দেখা যায়। আমি মনে মনে চাইছিলাম অন্যরা নয়, শুধু মায়া আমার দিকে একবার তাকাক্। সেই জন্যেই মনে মনে ঐ সংলাপ।

সারাদিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করেছি তো, তাই সেটা উসুল করার জন্য ঘুরছি এখানে-সেখানে। বিনা কাজে। ট্যাক্সিওয়ালাকে অবশ্য বুঝতে দিচ্ছি না সেটা, দারুণ ব্যস্ত দেখাচ্ছি—এই তো একটু আগে একটা জায়গায় ট্যাক্সি থামিয়ে একটা বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে বলেছিলাম অপেক্ষা করতে। আসলে ড্রাইভারকে ঠকাবার জন্য আমি দোতলার উঠে একটা রেকর্ডের দোকানে ঢুকেছিলাম—রেকর্ড কিনবো এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে পর পর চারখানা নতুন গানের রেকর্ড বাজিয়ে শুনলাম তারপর পছন্দ হচ্ছে না বলে, একটাও না কিনে চলে এলাম। মিনিট পঁচিশ কাটলো তো। ড্রাইভারকে ঠকাচ্ছি, না নিজেকে?

ওদের চারজনকে এখনো দেখতে পাচ্ছি ঘাড় ঘুরিয়ে। ওদের চারজনের পিঠ। যা আশা করেছিলাম, মায়ার পিঠের দিকটাও সুন্দর ইংরিজি

ভি অক্ষরের আকারের পিঠ। আমি ট্যাক্সি থামিয়ে ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো ? ওরা আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে যাবে !
কিন্তু সেটা আমার পক্ষে খুব দৃষ্টিকটু হবে কি ? ছেলে দু'টির সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়েছেই অনায়াসেই বলা যায়, কি ব্যাপার, আপনারাও আসানসোলে এসেছেন বুঝি ?

মায়া তো ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছিল. এখন সামনা-সামনি আমাকে দেখলে খুশী হবে না ? আমাকে নয় অবশ্য, অসিত মজুমদারের মতন চেহারার একজন লোককে।
গেলাম না। ট্যাক্সি অনেক দূরে চলে গেল. ওরা এখন দৃষ্টির আড়ালে। ওরা হারিয়ে যাবে না তো ? দৈবাৎ একবার দেখা পেয়েছিলাম, আর যদি না পাই। না না, ব্যস্ততার কিছু নেই. দেখা ঠিক হবেই। নিশ্চয়ই দেখা হবে, মনের জোর থাকলে ব্যর্থ হবার কথা নয়। যাক, আগে জ্যোতি রায় চৌধুরীর পালা চুকিয়ে ফেলা যাক্।
মনীশকাকার বাড়ি ভর্তি লোক ভেতরের ঘরে মনীশকাকা সিংহের ডাক ডাকছেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মনীশকাকা বলছেন, এই শোনো, একটা সিংহ এসেছে. এই রকম করে ডাকছে. গ-র-র আঁও। গর্-র র-র আঁও !
সেই অবস্থায় মনীশকাকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। মনীশকাকা বললেন, কবে এলি রে ! আগে খবর দিস নি তো ! যা. ভেতরে যা, তোর কাকীমা ঠাকুর ঘরে আছেন !
তারপর মনীশকাকা আবার চোখ গোল গোল করে বললেন, এইবার একটা বাঘ আসবে. শুনবে বাঘের ডাক !
মনীশকাকার বড় মেয়ে সীমা এসেছে কানপুর থেকে। সীমার দু'টি ছেলে মেয়ে। ছোট ছেলেটি বয়েস তিন বছর, কি সুন্দর ফুটফুটে দেখতে একেবারে দেবশিশুর মতন। কিন্তু এইসব দেবশিশুরা আজকাল খাওয়ার সময় এমন বায়নাক্কা করে ! তারা একটু খাবার খেয়ে যেন বাড়ির লোককে ধন্য করে দেয়। সীমা, খাবারের বাটি নিয়ে ছোটাছুটি করছে ছেলের সঙ্গে, আর মনীশকাকা নাতিকে ভোলাবার জন্য পর্যায়ক্রমে সিংহ আর বাঘের ডাক ডাকছেন।
চুলগুলো সব পেকে গেছে মনীশকাকার, বিশাল চেহারাটা বয়সের ভারে কিন্তু নুয়ে পড়েনি, মাথা ঝাঁকিয়ে যখন সিংহের ডাক ডাকছিলেন তখন

অনেকটা সিংহ সিংহই দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, মনীশকাকা, আপনার ডাক শুনে আমিই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলুম, আর আপনার নাতি কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছে না।

মনীশকাকা বললেন, আজকালকার ছেলে তো! আমাদের ছেলেবেলায় যদি আমরা এত আদর যত্ন পেতুম, ধন্য হয়ে যেতুম! বুবুল, খেয়ে নাও, লক্ষ্মী সোনা দাদু আমার, আর এক চামচ খাও!

সীমা বললো, জ্যোতিদা, অনেকদিন পর দেখলুম তোমাকে। বিশেষ বদলাও নি তো?

—বদলাই নি?

—একটুও না।

—তুই কিন্তু অনেক বদলেছিস, সীমা!

—বাঃ, বদলাবো না, দুই ছেলে-মেয়ের মা হয়েছি!

সীমা হিমানীশের চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমারও তাই। ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ও আমারও নিজের বোনের মতন। মনীশকাকা যখন কলকাতায় বাড়ি নিয়েছিলেন, আমি দিনের পর দিন সে বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। বন্ধুর বোন হিসেবে সীমার সঙ্গে একটু প্রেম-ট্রেম করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু এতই ছেলেবেলা থেকে চেনা যে সে কথা কখনো মনে আসে নি।

সীমা বললো, যাও, ভেতরে ঠাকুর ঘরে সবাই আছে। মা একটা ব্রত করেছে! রেবাও এসেছে।

—তাই নাকি, রেবা এসেছে? কবে?

—এই তো, কাল বিকেলের ট্রেনে।

—বাঃ, বেশ ভালো সময়ে এসেছি। তোর সঙ্গে আর রেবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

রেবা হিমানীশের স্ত্রী। মৃত্যুর ঠিক ন' মাস আগে বিয়ে করেছিল হিমানীশ, বাবা মা-কে না জানিয়ে। রেবার সঙ্গে ওদের জাতের মিল নেই, হিমানীশ ভেবেছিল বাবা মা এই বিয়েকে মেনে নিতে পারবে না। ঠিক করেছিল, ভালো চাকরি পেলে তাকে অন্য জায়গায় থাকতে হবে। সেখানে সংসার পেতে বাবা-মাকে জানাবে। সংসার পাতা আর হয় নি, রেবার প্রায় চোখের সামনেই ঘূর্ণি জলের টানে তলিয়ে গেল।

হিমানীশের মৃত্যুর পর আমিই ওর বিয়ের কথা বলেছিলাম মনীশ-

াকাকে। বলাটা দরকার ছিল। হিমানীশ মারা গেছে বটে, কিন্তু াবার অবস্থা কি হবে? তার বিয়ের কথাটা যদি প্রকাশ না পায়, তাহলে ার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়? তার বিধবা পরিচয়টা গোপন করে মারী হয়ে থাকা বিপজ্জনক, রেবা তা চায়ও নি। দারুণ ভালোবাসতো া হিমানীশকে, তা ছাড়া তখন তার ধারণা, হিমানীশের সন্তান তার র্ভে। সে ধারণা অবশ্য ভুল ছিল।

ামার মুখে শোনামাত্র মনীশকাকা রেবাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে সেছিলেন। হিমানীশ বেঁচে থাকলে বিয়েটা সত্যিই হয়তো তিনি নতে পারতেন না চট করে, কিন্তু মৃত্যুর পর হিমানীশের যে-কোনো ৃতিই তাঁর কাছে প্রিয়। হিমানীশ তাঁর একমাত্র ছেলে, তাই হিমানীশের ীকে তিনি পরম যত্নে রাখতে চেয়েছিলেন।

বা খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিল এ বাড়ির সঙ্গে। যখন বিধবা য়, তখন তার বয়েস বাইশ। রেবা বি. এসসি. পাশ ছিল, দু'এক বছর দে প্রাইভেটে ইংরেজি বাংলায় বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে, এম. এ.-টাও পাশ রে নেয়। তারপর কলকাতায় গেল এম. এড. পড়তে। মনীশকাকা াপত্তি করেন নি, তিনিই দিয়েছেন রেবার পড়ার খরচ, রেবাকে একটুও ষ্ট করতে দেন নি।

খন রেবা বহরমপুর না কোথায় যেন বি. টি. কলেজের লেকচারার। দলির চাকরি, প্রায়ই নানা জায়গায় বদলি হয়। মনীশকাকার সম্পূর্ণ ত আছে এতে। আমি জানি, রেবা যদি আবার একটা বিয়ে করে— নীশকাকা তাতেও আপত্তি করবেন না। পুত্রবধূ হিসেবে নয়, নিজের য়ের বিয়ের মতই ধুমধাম করবেন!

বাড়িতে বেশ একটা হৈ-চৈ এর আবহাওয়া। অনেকদিন বাদে সীমা সেছে ছেলে মেয়ে নিয়ে, রেবা এসেছে, সবাই খুব আনন্দ করছে। নীশকাকাও নাতিকে নিয়ে মেতে উঠেছেন। হিমানীশের কথা ঠিক খন বোধহয় কারুর মনে পড়ছিল না, কিন্তু আমাকে দেখে পড়বে। বাড়িতে আমার পরিচয়, আমি হিমানীশের বন্ধু। বাড়ির ছেলের মতন লেও ঠিক বাড়ির ছেলে নই। এ বাড়ির একটি মাত্র ছেলের স্মৃতি াগে আছে আমার গায়ে—হিমানীশকে আমার আর তেমন মনে পড়ে এখন, কিন্তু আমাকে দেখলে হিমানীশের কথা মনে পড়ে এ বাড়ির বার।

মনীশকাকা বললেন, জ্যোতি, তোর মালপত্র কোথায় ? আনিস
কিছু ?

মনীশকাকার কাছে আমার হোটেলে ওঠার কথা এক্ষুণি বলতে সাহ
হলো না। যেন শুনতে পাইনি ওঁর কথা এই রকম একটা ভাব করে আ
তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলাম।

ঠাকুর ঘরে বেশ একটা হাসি খুশীর ব্যাপার চলছে। পুজো-আচচা,
পার্বনের খুব বাতিক আছে কাকীমার। উনি পূর্ববঙ্গের মেয়ে। কি
বাড়ির ছেলে মেয়েরা কেউ ওসবের ধার ধারে না। মনীশকাকাও নাস্তি
মানুষ। এমন কি, একমাত্র ছেলে মারা যাবার পরও ঈশ্বরের আশ্র
ভিক্ষে করেন নি।

বাড়ির ছেলে মেয়েরা কাকীমার পুজো-টুজো নিয়ে খুব মজা করে
হিমানীশ বেঁচে থাকতে প্রায়ই বাসি কাপড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে পুজো
সময় মাকে ছুঁয়ে দেবার ভয় দেখাতো। একমাত্র আমিই শুধু কাকীমাকে
খুশী করার জন্য একটু একটু ভক্তির ভাব দেখাতুম। কাকীমা পুজো
প্রসাদ দিলে, হিমানীশের মতন আধখানা খেয়ে আধখানা ফেলে প্যান্টে
পকেটে হাত মুছতুম না। প্রসাদটা হাতের মুঠোয় নিয়ে কপালে ছুঁই
চোখ বুজে প্রণাম করতাম পর্যন্ত। মাঝে মাঝে কারুকে খুশী করতে
খুব ভালো লাগে আমার। আর কাকীমা এত সরল ভালো মানুষ যে
ওঁকে খুশী না-করার কোনো মানে হয় না।

সীমার বড় মেয়ে হৈমন্তী, বয়স ন' বছর, সীমার ছোট বোন ঝুমা—বয়ে
ষোলো, আর রেবা বসে আছে, ঠাকুর ঘরের মেঝেতে। রেবা আমাকে
দেখে বললো, আপনি কবে এসেছেন ?

—কাল।

—কিসে এলেন, ট্রেনে ?

—হ্যাঁ। তুমি কোন্ ট্রেনে এসেছো ?

- তাই বলুন ! কাল আমি আপনাকে দেখেছি।

- কোথায় ?

—একটা স্টেশনে।

—কোন্ স্টেশনে ?

—সে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। পরে বলবো

রেবা অনেক কিছু থেকেই মজা খুঁজে পায়। ভারী ছটফটে আমু

রনের মেয়ে, বৈধব্যের সামান্য চিহ্নও নেই ওর চেহারায়। রেবা রঙীন াড়ী পরে, কপালে টিপ আঁকে ; যখন হাঁটে—তখন চলার ভঙ্গিতে ন্থরতার বদলে একটা ছন্দ আসে।

মা বললো, এই তো জ্যোতিদা এসেছে। মা, জ্যোতিদা তো বামুন! তামার সুবিধে হয়ে গেল!

াামি বললুম, কেন, বামুন হবার কি সুবিধে? আমাকে পুজো করতে বে নাকি?

বা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমাদের পুরুতের অভাব। াপনাকে আজ পুজো করতে হবে!

াামি নকল ভয় দেখিয়ে বললাম, ওরে বাবা, এখন আবার কি পুজো? মুন হলেও, আমার পৈতে নেই যে!

বা বললো, চেনা বামুনের পৈতে লাগে না!

মা বললো, না, না, পুজো করতে হবে না। জ্যোতিদা, আপনাকে ধু একটা সন্দেশ খেতে হবে!

-সে তো এমনিতেই খেতাম। বামুন না হলে বুঝি সন্দেশ খেতে পায় , এ বাড়িতে!

-না, তা নয়। এই সন্দেশটা আপনাকে চোখ বুজে একেবারে গপ্ করে য়ে ফেলতে হবে!

কীমাও মিটিমিটি হাসছেন। গরদের কাপড় পরে বসে আছেন কুশাসনে। কীমা বললেন, জুতো খুলে ভেতরে আয়। আমি এই সন্দেশটা দিচ্ছি, লগোছে নিবি—

-কাকীমা, এটা আবার কি ব্রত? এই ব্রতে শুধু সন্দেশ খাওয়াতে য়?

মা গরদের শাড়ী পরে বসেছে। একটু লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছে সে আজকাল, য়ের কথা শুনে পুজোয় বসছে তা হলে! কিন্তু তার মুখে দুষ্টু সি। সে বললো কাল চড়ক সংক্রান্তি গেল না? মা কাল থেকে আর লো ব্রাহ্মণ খুঁজে পাচ্ছে না! নিন্ সন্দেশটা চট্ করে খেয়ে ফেলুন!

-কাকীমা, এটা কি ব্রত আগে বলে দিন!

-আগে, সন্দেশটা নে, তারপর বলছি। দু' হাত পেতে নিবি।

-শুধু সন্দেশ, আর কিছু না?

মা বললো, হ্যাঁ, আরও পাবেন, পৈতে, হরতুকী, আর খড়ম!

সবাই হাসিতে লুটোতে লাগলো একেবারে ! ততক্ষণে সীমাও এ
দাঁড়িয়েছে। মনীশকাকাও আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছেন, ব্যাপার
উপভোগ করতে চান।
সন্দেশটা নিয়ে খেতে গিয়েও আমার কি রকম সন্দেহ হলো।
আমার দিকে বড় বেশী ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে, মুখে চাপা হাসি।
ব্যাপার, গলায় আটকে ফাটকে যাবে না কি ?
রেবা বললো, নিন্, নিন্, খেয়ে ফেলুন ! বেশীক্ষণ হাতে র
নেই !
মুখের কাছে নিয়ে এসেও আমি হাত সরিয়ে বললুম, উঁহু, এর
নিশ্চয়ই একটা ব্যাপার আছে !
আবার সবাই হাসিতে গড়াগড়ি। রেবা বললো, বাবা, কি ভীতু আ
একটা সন্দেশ খেতেও এত ভয় ? তা, তো আপনাকে খড়ম পরে হাঁটা
বলা হয়নি ?
ঝুমা বললো, কিংবা জামা খুলে পৈতে পরতে বলা হয়নি !
—না, আমি সন্দেশ খাবো না। আমি হরতুকি খাচ্ছি !
কাকীমা এবার এক গাল হেসে বললেন, নে, অনেক হয়েছে
তোকে সন্দেশটা একবারে খেতে হবে না। তুই দু' আধখানা করে খা
সন্দেশটা ভাঙতেই ভেতর থেকে একটা সিকি বেরিয়ে পড়লো।
অবাক হয়ে বললাম, এ আবার কি ? আমাকে পয়সা খাওয়াচ্ছেন ে
আমি কি গভর্ণমেণ্ট অফিসার ?
রেবার চাকরিটা সরকারী। সে ফোঁস করে উঠলো, এই,
অফিসার হলেই বুঝি পয়সা খায় ?
আমি বললাম, তোমার চাকরিতে পয়সা খাওয়ার স্কোপ নেই, তুমি অ
কি জানবে ! যাক গে, কাকীমা, সন্দেশের মধ্যে পয়সা কেন ?
ঝুমা বলল, জানেন না বুঝি, গুপ্তধন ব্রতে তো সন্দেশের মধ্যে পয়
রাখতে হয় !
আমি বললাম, বাঃ বা ! ব্রাহ্মণকে পয়সা খাইয়ে গুপ্তধন পাবার মত
বুঝি ? এটাও ঘুষ ! তাহলে সিকির বদলে মোহর দেওয়া উচিত ছি
আমাকে সিকি দিয়েছো, তোমরাও শুধু সিকি পাবে !
কাকীমা বললেন, যা জ্যোতি, এবার বাইরে যা। এবার ঝুমার
হবে।

—ঝুমা আবার কি ব্রত করবে ?
ঝুমা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললো, আমি হরির চরণ ব্রত করছি।
হরির চরণ ? সে আবার কি—কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম শুনছি। আমরা তো জানতুম সেঁজুতির ব্রত কিংবা—
—সেঁজুতির ব্রত তো কার্তিক মাসে। মাকে প্রত্যেক মাসে এক একটা করতে হবে না ?
ঝুমা কথা বলছে নকল সীরিয়াস ভঙ্গিতে। মাকে খুশী করার জন্য। ভাবখানা এমন দেখাচ্ছে যেন, এসব ব্রত-ট্রত সব ওর মুখস্ত। অথচ মিশনারি স্কুলে পড়েছে ঝুমা, বাংলা ভাষাটাই ভালো জানে না।
কাকীমা তাড়া দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোরা এখন যা দিকিনি। ঝুমা ভালো করে বোস্। চন্দনটা ঘষে নে !
—না কাকীমা, আমরাও ব্রত দেখবো !
—চুপটি করে বসে থাকবি তা হলে। কথা বলবি না !
রেবা আমাকে ওর পাশে বসার ইঙ্গিত করে বললো, বেশ লাগে কিন্তু এখন এসব দেখতে। কম বয়েসে এসব নিয়ে ঠাট্টা করতুম, এখন কিন্তু—
—তোমার আফশোস হচ্ছে বুঝি ? তুমিও ঝুমার মতন একটা কিছু ব্রত করো না !
—ধ্যাৎ বোকা ! বিধবাদের বুঝি ব্রত করতে হয় ?
কথাটা রেবা ম্লান মুখে কিংবা দুঃখের সুরে বলেনি। হাসিমুখেই। তবু আমি চুপ করে গেলাম। রেবা রঙীন শাড়ী পরে, মাছ মাংস খায় —কিছুই বিধবার মতন নয়, তবু কুমারীর মতন ব্রত পালন করা বোধহয় তাকে মানায় না।
দেখতে বেশ লাগছিল। মনটা বেশ খোলামেলা হয়ে গেছে। এ রকম পারিবারিক অনাবিল হাসি আনন্দের মধ্যে এসে পড়লে মনটা সুস্থ হয়ে যায়। মনীশকাকা এখানকার অতি বিখ্যাত জাঁদরেল ডাক্তার এবং নাস্তিক, তাঁর বাড়ির মধ্যে বসে এরকম মেয়েলি ব্রতকথা শুনতে একটুও বেমানান হচ্ছে না। এমন কি মনীশকাকাও বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আড়চোখে এদিকে দেখছেন। কয়েক ঘণ্টা আগে কয়লাখনির অন্ধকারে নেমে আমার খুব সাধ হচ্ছিল, আত্মপরিচয় টের পাওয়ার জন্য কয়েকদিন মাটির তলায় অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকি। এখন ঠাকুর ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছি, তিনটে জানলা দিয়ে হুড় হুড় করে ঢুকছে

দুনিয়া জোড়া আলো, মনের ভেতরটা খুব নরম হয়ে এলো।

সাদা চন্দন বাটা হয়েছে, একটা তামার থালায় সেই চন্দন দিয়ে ঝুমা দুটো ছোট ছোট মানুষের পা আঁকলো কাকীমার নির্দেশে। তারপর দু আঙুলে ধরে রইলো মল্লিকা ফুল, দুর্বো, তুলসী পাতা। কাকীমা বললেন, নে, এবার মন্ত্র বল্—

কাকীমার মুখ থেকে শুনে শুনে ঝুমা বলতে লাগলা ঃ

হরির চরণ হরির পা
হরি বলে ওগো মা
আজ কেন গো শীতল পা
কোন যুবতী পুজে পা ?
স যুবতী কি চায় ?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়······

সীমার মেয়ে হৈমন্তী হঠাৎ বলে উঠল, এ মা, দিদু, দ্যাখো, দ্যাখো, ছোট মাসী হাসছে !

হাসি সামলাতে গিয়ে ঝুমার চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল। এবার একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলো। মিশনারী স্কুলে পড়েছে ঝুমা শিগগিরই কলেজে ভর্তি হবে, মুখে তার ইংরিজির খই ফোটে, ইংরিজি গানের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে পারে—সে স্বামী পাবার জন্য ব্রত করবে ? তার তো হাসি পাবেই। আমি ধমকে দিয়ে বললাম, এই ঝুমা, কি হচ্ছে কি ? হাসছো কেন ?

হিমানীশ মারা যাবার পর থেকেই কাকীমার মাথায় সামান্য একটু গোল-মাল দেখা দিয়েছে। বাড়ির মেয়েরা তাই কাকীমার এসব বাতিককে প্রশ্রয় দেয়। কাকীমাকে আঘাত দিতে চায় না। কাকীমা দুঃখিতভাবে বললেন, ওমা, তুই হাসছিস ? ব্রতের মধ্যে হাসলে যে অমঙ্গল হয়।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ঝুমা বললো, না মা, তুমি আবার বলো।

···সে যুবতী কি চায় ?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়
প্রেমানন্দ ভাই চায়
ঘরণী গৃহিণী বউ চায়···

হৈমন্তী আবার বলল, এ কি দিদু ? মেয়ে হয়ে আবার বউ চাইবে কেন ?

ছেলেমানুষী প্রশ্ন। কিন্তু চকিতে রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ঝুমা আর তো কোন ভাই পাবে না! সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে আমি হৈমন্তীকে বললাম, বউ মানে, ছেলের বউ। ওর যখন ছেলে হবে, তার বউ যেন—
রেবা ফিসফিস করে বললো, বেশ শুনতে লাগছে না? এসব পুরনো জিনিস আমরা ভুলেই গেছি।
ঝুমা আবার বলতে লাগলো ঃ

ঘরণী গৃহিণী বউ চায়,
রূপবতী কন্যা চায়
আলনায় কাপড় দলমল করে
ঘরের বাসন ঝকমক করে
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান
বছর বছর পুত্র পান
না দেখেন স্বামী পুত্রের মরণ
না দেখেন বন্ধুবান্ধবের মরণ
হবে পুত্র মরবে না
চক্ষের জল পড়বে না
দিয়ে ছেলে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় গঙ্গা জলে……।

কাকীমা বললেন, নে, এবার প্রণাম কর। ওকি, ওরকম শুধু হাত জোড় করলে হয় না, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে—
ঝুমা ছাড়াও অন্য সব মেয়েরা, এমনকি রেবা পর্যন্ত মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। পুরুষ মানুষদের ওরকম করতে নেই, আমি মাথা উঁচু করে রইলাম। তাই দেখতে পেলাম, কাকীমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। শেষের অংশটা বলার সময়েই, যেখানে ছিল, হবে পুত্র মরবে না, চক্ষের জল পড়বে না সেইখানে কাকীমার নিশ্চয়ই একমাত্র ছেলের কথা মনে পড়েছিল।
কাকীমাকে ভোলাবার জন্যেই আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কাকীমা বিধবাদের কোন ব্রত হয় না?
এইসব কথা বলতে কাকীমার খুব উৎসাহ। তিনি তক্ষুণি চোখের জল মুছে বললেন, হবে না কেন, নিশ্চয়ই হয়।

—কি রকম, একটা বলুন তো !

দরজার কাছ থেকে সীমা বললো, জ্যোতিদা, তোমার হঠাৎ বিধবাদের ব্রতের কথা শোনার ইচ্ছে হলো কেন ?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমার নিজের জন্য নয়। রেবার জন্য। ও বড্ড কান্নাকাটি করে—ওরও তো একটু শান্তি পাওয়া দরকার !

রেবা আমার গায়ে একটা চিমটি কেটে বললো, ই-স ! আমি কান্নাকাটি করি, আপনি বুঝি দেখেছেন ?

কাকীমা তন্ময় হয়ে ছিলেন, এসব শুনতে পেলেন না। বললেন, একটা আছে, বারো মেসে অমাবস্যার ব্রত।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বারো মেসে অমাবস্যা আবার কি ব্যাপার ! বারো মাস ধরে অমাবস্যা থাকবে ?

কাকীমা বললেন, না. এ ব্রত করলে অমাবস্যা কেটে যায়। এটা করতে হয় প্রত্যেক অমাবস্যার দিন, উপোস করে। স্নান করার সময় সূর্যকে পুজো করে—

– কাকীমা, অনেক ব্রতের তো একটা করে গল্প থাকে। এর গল্প নেই ?

—তা থাকবে না ? গল্প কি, সত্যি কথা—

—বলুন না সেটা—

কাকীমা একটু চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকালেন. তারপর ঝুমাকে বললেন ঝুমা, তোর তো হয়ে গেছে, তুই ওঠ। হৈমন্তীকে নিয়ে তুই এবার ওপরের ঘরে যা।

—না, আমিও গল্প শুনবো !

—এ গল্প তোদের শুনতে নেই। কুমারী মেয়েরা এ গল্প শোনে না।

—মা. দিস ইজ টু মাচ্ ! এতটা বাড়াবাড়ি কোরো না। গল্প শুনবো. তার আবার কুমারী অকুমারী কি !

—গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।

—হলোই বা সত্যি ঘটনা। তা শুনলেও দোষ !

—বলছি, যা না হৈমন্তীকে নিয়ে। না হলে আমি বলবো না।

মুখ গোঁজ করে ঝুমা উঠে গেল। এমনিতে সে খুব জেদী মেয়ে, কিন্তু আজকাল ওরা কেউই মায়ের মুখের ওপর বেশী কথা বলে না। হৈমন্তী কিছুতেই যাবে না। কিন্তু সীমার এক ধমকেই কাজ হলো।

তখনও আমি জানি না, হঠাৎ শোনা একটা ব্রতের গল্পের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের অনেক মিল ঘটে যাবে। বিস্ময়কর যোগাযোগ বলা যায় একে।

কাকীমা শুরু করলেন ঃ

এক দেশে এক গরীব বামুনের একটিমাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রূপে যেমন কার্ত্তিকের মতন, গুণেও সে রকম, সবাই ছেলেটিকে দেখে ধন্য ধন্য করতো। গরীব বামুন আর তার বউ সেই ছেলেকে পেয়ে সব দুঃখ কষ্ট ভুলেছিল। ছেলেটি যেখান দিয়ে হাঁটতো তার বিদ্যেবুদ্ধি একেবারে ঠিকরে পড়তো!—

রেবা বললো, মা, বিদ্যেবুদ্ধি আবার ঠিকরে পড়ে কি করে?

না হেসে উপায় নেই, আমরা মুখ ফিরিয়ে হাসলাম। কাকীমা বললেন, কথার মাঝখানে কথা বলো না! ব্রতকথা একমনে শুনতে হয়। পা ঢাকা দিয়ে বসো। আমি কি আর তোমাদের মতন লেখাপড়া জানি!

—না, কাকীমা, আপনি বলুন।

—সেই ছেলের যখন ষোলো বছর বয়স হলো, বাপ মা তার বিয়ে দিলে। টুকটুকে সুন্দরী বউটি, সবাই বলতো ইন্দ্রের পাশে যেন লক্ষ্মী!

আমি শুধরে দিলাম, না কাকীমা, ওটা হবে বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী।

কাকীমা একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, ঐ হলো, ঠিক যেন লক্ষ্মী-জনার্দন! আলতা পরা পায়ে রূপোর মত ঝুমঝুমিয়ে মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে, বামুন বামনির মন ভরে যায়, আর ছেলে ওদিকে উপায় রোজগার করে বাপ মা-কে খাওয়ায়।

কিন্তু এত সুখ ওদের কপালে সইলো না। ছেলে একদিন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে শিবমন্দিরে পুজো করতে, এমন সময় তাকে সাপে কাটলো। এত বড় এক গোক্ষুর সাপ—

—মা, আপনি হাত দিয়ে যতখানি দেখালেন সাপটা অতটা মোটা না লম্বা?

—এই রেবা, গল্পের মাঝখানে ডিসটার্ব করো না! গোখরো সাপ কত বড় হয় তোমার আইডিয়া আছে?

—কত বড় হয়? থামের মতন মোটা হয়? সে তো পাইথন। পাইথনের বিষ নেই!

—জ্যোতিদা, এখন সাপের কথা হবে, না গল্প শুনবে?

—হ্যাঁ, কাকীমা. আপনি বলুন।

—সেই সাপের কামড় খেয়ে, বামুনের ছেলে প'লো আর ম'লো! মরার সময় সে শুধু একবার জল জল করে চেঁচিয়েছিল, তার বাপ-মা মৃত্যুকালে তাকে এক ফোঁটা জলও দিতে পারলে না! খবর পেয়ে বামুন-বামনি আর ছেলের বউ যখন এলো, তখন বামুনের ছেলের দেহ একেবারে নীলবন্ন হয়ে গেছে।

সুখের সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। দিনের পর দিন বামুন-বামনি আর তাদের বউ শুধু চোখের জল ফেলে, কাজকম্ম করে না।

রান্নাবাড়ি করে না—পাড়া প্রতিবেশী এসে রোজ জোর করে খাইয়ে যায়, এমনি করে এক বছর বাদে বামুনও মনের দুঃখে মারা গেল। বামনি আর বউ অতিকষ্টে সংসার চালাতে লাগলো—

একদিন তাদের বাড়িতে এক অতিথি এলো। সেকালের দিনে যতই অভাবের সংসার হোক, অতিথি এলে কেউ ফেরাতো না। বামনি চোখের জল মুছে অতিথিকে পা ধোবার জল দিলে।

অতিথির বয়েস বেশী না, তবে মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা, পরনে ছেঁড়া কাপড়। সে বললে, মা, আমাকে এক মুঠো ভাত দে!

বামনি তাড়াতাড়ি রান্নার জোগাড় করতে গেল। অতিথি বললে, আমি চান করবো, কিন্তু আমার তো আর বস্তর নেই। আমাকে একখানা কাপড় দাও।

বামনি কাঁদতে কাঁদতে বললো, বাবা, আমরা মায়ে-ঝিয়ে থাকি, আমাদের নিজেদেরই বস্তর জোটে না, পুরুষ মানুষের বস্তর কোথায় পাবো? তবে আমার ছেলের একখানি কাপড় আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সেইটে পরো। অতিথি চান করে সেই কাপড় পরে খেতে এলো।

বামনি তাকে ধোওয়া কলাপাতায় আতপ চালের ভাত আর ঝিঙে সেদ্ধ বেড়ে দিল। অতিথি বললে, মা, আমি কলাপাতায় খাই না। তোমার ছেলের থালায় আমাকে ভাত বেড়ে দাও, ছেলের গেলাসে আমাকে জল দাও, নইলে আমি খাবো না!

বউ তা শুনে ভারী রাগ করে বললে, অতিথির আবার এত আবদার কেন? যেতে দাও, ওতে দাও, না খাবে তো চলে যাক।

বামনি বললো, রাগ করো না, বউমা। ও থালা গেলাসে আর কে খাবে? অতিথিকে দাও, তাহলে সার্থক হবে! বউ তখন আর কি করবে, থালা

গেলাস বার করে দিলে !
অতিথি তৃপ্তি করে ভাত খেয়ে বললো, বাঃ, অনেকদিন পরে বেশ ভালো খেলাম। এখন একটু শোবো !
রেবা বললো খেতে পেলেই শুতে চায় ! সেকালের অতিথিরা বেশ ছিল কিন্তু !
—রেবা, আবার ! কাকীমাকে গল্পটা বলতে দাও !
কাকীমা এখন চোখ বুজে গল্প বলছেন। আমাদের মুখের ছোটখাটো হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছেন না। গল্প বলতে এতই ভালোবাসেন যে বাধা পড়াতেও খুব বিরক্ত হচ্ছেন না।
আবার বলতে লাগলেন, অতিথি বললো, আমি কিন্তু পুরুষ মানুষের বিছানায় ছাড়া শুই না। তোমার ছেলে যে ঘরে শুতো. সেই ঘরে তোমার ছেলের বিছানা আমার জন্য পেতে দাও।
সেই বিছানায় শুয়ে অতিথি ফের বললে—
এবার সীমা গল্পে বাধা দিয়ে, বললো, বাঃ, সেকালে লোকে চুরি-ডাকাতি করতো কেন তাহলে ? কারুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেই তো খাওয়া-পরার চিন্তা ঘুচে যেত।
ইস্, কেন যে সেই সময় জন্মাইনি।
কাকীমা বললেন, তখনকার দিনে লোকে মিথ্যে কথা বলতো না। মিথ্যে মিথ্যে কারুর অতিথিও হতো না। মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতো !
—কাকীমা, গল্পটা বলুন !
—অতিথি ফের বললে, মা, তোমার বউকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও আমার পা টিপে দেবে ! পা টিপে না দিলে আমার ঘুম হয় না !
—ইস্ নবাব পুত্তুর।
—রীতিমতন স্কাউন্ড্রেল।
কাকীমা, আপনি বলুন !
—বউও তোদের মতন রেগে গিয়ে বললো, না, আমি যাবো না। আমি পরপুরুষের গা ছোঁবো না ! বামনি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে, যাও মা, অতিথি রাগ করলে বড় পাপ হয়। অতিথিকে বিমুখ করতে নেই। দরজা খোলা রেখে শুধু একটু পা টিপে দিয়ে আসবে—রাজা কর্ণ অতিথিকে খুশী করার জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিয়েছিলেন—
রেবা হাই তুলে বললো, একটা স্যাড ব্যাপার কি, এইসব গল্পের আরম্ভটা

বেশ ইণ্টারেস্টিং হলেও শেষের দিকে খুব ভাল হয়। শেষে দেখা যাবে, কৃষ্ণ ছদ্মবেশে ওদের পরীক্ষা করতে এসেছিলেন! পরীক্ষায় পাশ করলেই অনেক টাকা পয়সা পেয়ে যাবে, এমনকি মরা ছেলেও বেঁচে উঠতে পারে।

আমিও সেরকম সন্দেহ করেছিলাম। একটু হতাশ হয়ে বললাম, কাকীমা, শেষটা কি তাই নাকি? তাহলে বলে দাও আর শুনবো না!

কাকীমা চোখ বুঁজে হাত জোড় করে বসে আছেন, মুখে একটা তন্ময় ভাব। বললেন, অত কথা বলিস নি, চুপটি করে শোন্— । বউ তখন আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো, অমনি আপনা-আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে। শ্বাশুড়ি তখন আথালি-পাথালি করে ছুটে এসে বললো, বৌমা দরজা খোলো, দরজা খোলো। বউও ছুটে এসে অনেক ধাক্কাধাক্কি করল, কিন্তু দরজা খুললো না কিছুতেই। জলভরা চোখে বউ তাকিয়ে দেখে বিছানার ওপর বসে অতিথি মিটিমিটি হাসছে—

রেবা এবার কিছু বললো না, শুধু কুটুস করে আমার পিঠে একটা চিমটি কাটলো। আমি ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বললুম, চুপ। সীমাও আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। কাকীমার মুখে এই গল্প শুনতে আমাদের একটু লজ্জা করছে, কিন্তু কাকীমার কোনো হুঁস নেই। উনি সেকেলে লোক, এ বাড়ির আধুনিক আবহাওয়াতেও উনি সেকেলে রয়ে গেছেন, এখনো ঝিয়ের ওপর বেশী রাগ হলে বলেন, ঝি মাগী।

কাকীমা বলতে লাগলেন, বউ তখন কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললো, আপনি কে আমি জানি না। আপনি কেন আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন? আমি স্বামী বৈ আর কারুকে জানি না, আমার স্বামী স্বর্গে গেছেন, আমি এখনও মনে মনে তাঁর চরণ দু'খানি পুজো করি, আপনি আমাকে বাঁচান!

অতিথি বললে, আমায় তুমি চিনতে পারছো না?

—না।

—ভালো করে তাকিয়ে দেখো।

—আমি অন্য পুরুষের মুখের দিকে তাকাই না।

—একবার তাকিয়ে দেখো, আমি বলছি, তাতে কোনো দোষ হবে না।

—দেখেছি। না আপনি কে, আমি জানি না। দরজা খুলে দিন, আমাকে রক্ষা করুন!

অতিথি তখন জটাজুট সব খুলে ফেললে। গালে হাত বোলাতে দাড়িও খসে গেল। অবিকল তার স্বামী সেই ব্রাহ্মণ-কুমারের চেহারা। সে বললো, এই দ্যাখ আমি ফিরে এসেছি!
বউ তো সেদিকে তাকিয়ে থ। বিশ্বাস হবে কি, সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। নিজের চোখে সে মরা-স্বামীর মুখ দেখেছে। গ্রামশুদ্ধু লোক তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছে। চিতার ধোঁয়া ওঠার পর হাতের শাঁখা ভেঙেছে, সিঁথের সিঁদুর মুছেছে। সে বিশ্বাস করলো না, অঝোর ধারে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনার চেহারা আমার স্বামীর মতন একরকম, তা সত্যি, কিন্তু তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে বাঁচান।
রেবা ফিসফিস করে বললো, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস নাকি?
আমি এবার গল্পটাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আমি রেবাকে থামিয়ে দিলাম।
কাকীমা বলে চলেছেন, অতিথি তখন একটা শুকনো নিশ্বাস ফেলে বললো, তবে আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যখন আমাকে চিনতে পারলে না —আমি আর থাকবো না। তোমাদের খাওয়া পরার খুব কষ্ট, এই মুক্তো ক'টা নাও তোমাদের খাওয়ার আর দুঃখ থাকবে না।
অতিথি তখন এক কোঁচড় বড় বড় মুক্তো দিল বৌয়ের হাতে। দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল আবার, অতিথি বেরিয়ে চলে গেল। শ্বাশুড়ি আথালি-পাথালি করে এসে বললে, কই মা, কি হলো? সে কোথায় গেল?
বউ সব কথা খুলে বলতে বামনির বিশ্বাস হলো যে, সত্যি তার ছেলেই ফিরে এসেছিল স্বর্গ থেকে। সে তখন দৌড়ে গেল সদরের দিকে অতিথিকে ধরতে, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পেল না। বামনি তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো।
দু'দিন তিনদিন বাদে বামনি আবার চোখ মুছে ঘর সংসার করতে লাগলো। বউ তখন সেই মুক্তোগুলো দেখিয়ে বললো, মা তিনি এগুলো দিয়ে গেছেন, এতেই আমাদের খাওয়া-পরার দুঃখ ঘুচে যাবে।
গরীব বামনি আর তার বউ কোনোদিন মুক্তো দেখেনি। তারা ভেবেছে, ওটাই খাবার জিনিস। একবার এই খাবার খেলে আর কোনোদিন খিদে পাবে না।

উনুনে আগুন দিয়ে তারা মুক্তোগুলো সেদ্ধ করতে লাগলো। খানিক পরে দেখলো মুক্তোগুলো সেদ্ধ হয়নি, তখন বউ বললে, একি কড়াই মা, কিছুতেই সেদ্ধ হয় না! শ্বাশুড়ি বললে, কড়াইগুলোকে নিয়ে খোলায় ভাজ, তাহলেই খাওয়া যাবে!

গণগণে আঁচে খোলায় ভেজেও সেগুলো খাওয়া গেল না, তখন হামান-দিস্তেয় গুঁড়ো করতে গেল, তাও হলো না। বউ তখন রাগ করে সেগুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলে। বৌয়ের বড় দুঃখ হলো, একে তো মরা মানুষ ফিরে আসে, এটা তার বিশ্বাস হয়নি, তারপর সে বলেছিল, মুক্তো-গুলোতে তাদের খাওয়ার কষ্ট ঘুচে যাবে—সেগুলোও খাওয়া গেল না! সে ভাবলো, তারা দুঃখিনী বলেই কোনো শঠ প্রতারক তাদের সঙ্গে মজা করতে এসেছিল।

এদিকে পাড়া প্রতিবেশী সব জেনে গেছে, তাদের মধ্যে ঢি ঢি পড়ে গেছে। শ্বাশুড়ি-বউকে দেখলেই পাড়ার মেয়ে-মানুষেরা গা টেপাটেপি করে। ওদের দিন চলা আরো ভার হলো। বামনি আর বউ দিনরাত দাওয়ায় বসে বসে কাঁদে আর সেই ছেলের কথা ভাবে।

শেষে, সেই অতিথি আবার এলো। আবার আগের মতন বললো, খিদে পেয়েছে, আমায় চারটি ভাত দাও!

বামনি ধড়ফড় করে চোখের জল মুছে উঠলো। অতিথিকে কিছুই বললো না। ভিক্ষে করে খুদ কুঁড়ো এনে রান্না চাপালো! তাঁর নিজের ছেলের থালায় ভাত বেড়ে দিল, ছেলের গেলাসে জল, ছেলের খড়ম পরতে দিল। অতিথি যখন খাচ্ছে, তখন বামনি ছেলের ঘরে ছেলের বিছানা পাতলো পরিপাটি করে, ঘরের সব ক'টি জানলা বন্ধ করে এঁটে দিল, যেখানে যে-টুকু ফাঁকফোকর ছিল, তুলো গুঁজে দিল সেখানে। তারপর অতিথি শুতে আসার পর বৌকে পা টেপার জন্য জোর করে ঘরে ঠেলে দিয়ে নিজেই দরজা বন্ধ করে কুলুপ লাগিয়ে দিল।

অতিথি তখন ব্যস্ত হয়ে বললো, ওকি মা, তুমি কুলপ লাগালে কেন? খুলে দাও!

বামনি বাইরে থেকে বললো, বাবা, আগে সত্যি করে বলো, তুমি কে?

অতিথি বললো, মা, আমি তোমার ছেলে!

বামনি বললো, মরা মানুষ কি ফিরে আসে? যদি আসে, তো কি করে আসে? গাঁয়ের যে-সব লোক আমার ছেলেকে পুড়িয়েছে, তাদের

ডাকবো, তাদের সামনে বলো, তুমি কে ?
—না না, মা, অমন করো না। দরজা খুলে দাও।
—আগে বলো তুমি কে ?
ঘরের মধ্যে বউও জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তুমি কে ? বাইরে থেকে শ্বাশুড়ি জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তুমি কে ?
অতিথি বললো, সেকথা বলার উপায় নেই।
এই বলে অতিথি অধোবদন হয়ে বসে রইলো। আর সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল. পশুপক্ষী মানুষজন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো. দিনের বেলাতেই মনে হলো ঠিক যেন রাত্তিরের মতন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অতিথি আবার বললো, মা, এখনো দরজা খুলে দাও, নইলে জগৎ ছারখার হয়ে যাবে।
বামনি বললো, যাক্ জগৎ সংসার, আগে বলো, তুমি কে ?
ঝন ঝন করে কলিংবেল বেজে উঠলো। গল্প থেমে গেল। ঝুমা এসে রেবাকে বললো, বৌদি, তোমাকে কারা ডাকতে এসেছেন !
রেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে এখানে আবার কে ডাকতে আসবে ?
—চার পাঁচজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা --
—ওঃ হো, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম।
গল্পে ব্যাঘাত ঘটায় আমি খুশীই হয়েছিলাম। এ গল্পের বাকিটা আমি আর শুনতে চাই না। এ পর্যন্ত আমার ভালো লেগেছে, ও পরের ব্যাখ্যা আমার ভালো লাগবে না। জানি, এর পর এই ঘটনার একটা সরল ব্যাখ্যা থাকবেই ! সেটা আমার শোনার দরকার নেই।
কিন্তু মেয়েদের গল্প শোনার কৌতূহল সাংঘাতিক, রেবা এতক্ষণ ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিল, এখন সে শেষটুকু না শুনে ছাড়বে না। রেবা ঝুমাকে বললো, তুমি ওদের একটু বসতে বলো, আমি আসছি এক্ষুণি। সীমা বললো, একি, তোমরা উঠছো কি, বাকিটা শুনে যাও ব্রতকথার অর্ধেক শুনে উঠে যেতে নেই।
আমি বললাম, কাকীমা, বাকিটা এবার সংক্ষেপে বলে দাও। বুঝেই গেছি অবশ্য কি হবে।
গল্প সংক্ষেপ করার ব্যাপারটা কাকীমার মনঃপূত হলো না। তাঁর মুখে তখনও তন্ময় ভাব। বললেন, তারপর তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এসে ব্রাহ্মণীর

কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, অতিথিকে ছেড়ে দাও! বামনি বললো, আগে আপনারা সত্যি সত্যি বলুন, ও আমার ছেলে কিনা।

ব্যাপারটা হলো কি, প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো দেবতার অংশে জন্ম। মৃত্যুর পর সে আবার সেই দেবতার শরীরে মিলে যায়। মৃত্যুর পরও সত্যি সত্যি মন-প্রাণ দিয়ে যদি তার কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে কখনো কখনো সেই দেবতা মূর্তি ধরে আসে। ঐ বামুনের ছেলেটি জন্মেছিল সূর্যের অংশে, পৃথিবীতে তার দিন ফুরোবার পর ফিরে গিয়েছিল সূর্যের কাছে। কিন্তু বামনি আর তার বউ এমন একনিষ্ঠভাবে তার কথা ভাবতো, যে স্বয়ং সূর্যদেব তাঁর পৃথিবীর রূপ ধরে আবার এসেছিলেন। না এসে পারেন নি। ডাকার মতন ডাকলে—

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে রেবা মুচকি হেসে বললো, বুঝতে পারলেন তো, গল্পটা আমার উদ্দেশ্যেই বলা। এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে।

—কেন, তোমার উদ্দেশ্যে কেন?

—বুঝলেন না? আমারও উচিত সারাক্ষণ আমার স্বামীর কথা ভাবা, তাহলে সে হয়তো ফিরে আসতে পারে। পরপুরুষের কথা আমার একদম চিন্তা করা উচিত নয়।

—তা তো ঠিকই! তবে, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। হিমানীশ আর আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, একেবারে হরিহর-আত্মা বলা যায়। হয়তো, হিমানীশের আত্মা আমাকে ভর করেও ফিরে আসতে পারে কখনো। তখন যদি আমি যাই, তাহলে যেন আবার চিনতে ভুল করো না?

রেবা ভ্রূভঙ্গি করে বললো, ইস্! খুব অসভ্য হয়েছেন আজকাল, না? আগে তো কখনো এ ধরনের কথা শুনিনি!

—আগে আমি এরকম ছিলাম না। এখন আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি!

—কি করে হবেন? চেহারাটা তো আর বদলাতে পারবেন না? চেহারাতেই ধরা পড়বেন!

—চেহারা!

রেবা হঠাৎ একটু ম্লান হয়ে গিয়ে বললো, আপনাকে একটা খবর আগে থেকে জানিয়ে রাখি। আমি একজনকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি! সে কথাই এবার এ বাড়িতে বলতে এসেছি!

-বিয়ে করছো ? দারুণ ! কাকে ?

·চুপ ! এখন কারুক্কে বলবেন না। আপনি চিনবেন না তাকে। াপনাকে পরে সব বলবো, ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি।

বা বৈঠকখানা ঘরে গেল তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি াতলায় উঠে এলাম ঝুমাদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস রলাম, ঝুমা, তোমার কাছে বাংলা ডিকশানারি আছে ?

-কেন, কি করবেন ?

সাহেবী ইস্কুলে পড়ো বলে কি বাংলা ডিকশানারিও রাখতে নেই ?

মা তার ঝক্‌মকে সাদা দাঁতে হেসে বললো, ডিকশানারি রাখতে হবে ন ? সব মুখস্ত ! আপনি কি কথার মানে জানতে চান, বলুন ?

-না, সেকথাটা তোমাকে বলা যাবে না।

কেন, কোনো অসভ্য কথা বুঝি ?

অসভ্য কথা নয়, গোপন কথা।

যে ঝোঁক চেপে গেল আমার, মনে হলো তক্ষুণি একটা ডিকশানারি পেলে আমার চলবেই না। ঝুমার বইয়ের আলমারি ওলোট-পালোট র ঘাঁটলাম। হিমানীশের কিছু বই এখনো রাখা আছে, তার মধ্যে টা ছেঁড়া বাংলা অভিধান পাওয়া গেল।

সিত কথাটার মানে দেখে আমি অস্ফুটভাবে বললাম, আশ্চর্য !

সিত মানে কালো। ন সিত। অর্থাৎ আমার নামের ঠিক বিপরীত যায়। এ কথাটার মানে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। লেপি দেহ আপনার করে সিত চন্দন পংকে—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছে।

া জিজ্ঞেস করলো, জ্যোতিদা, এটা কার নাম ? হঠাৎ অসিত-এর মানে নার জন্য আপনি পাগল হয়ে উঠলেন কেন ?

ম একমুখ হেসে ঝুমাকে বললাম, আমার আগের জন্মে ঐ নাম ছিল !

॥ ৫ ॥

মায়া, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?

ুমি কে ?

আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখো। এখনো চিনতে পারছো না ?

—না।
—সব মানুষেরই দেবতার অংশে জন্ম। আলো আর অন্ধকারের একই। আমি সেই দেবতার·····চিনতে পারো কি?
—তুমি কি?
হ্যাঁ, এবারও এই কথাগুলো হচ্ছিল আমার মনে মনে। সিগারেট ধর জন্য সামান্য সময় মুখ নীচু করে থাকতে থাকতেই আমি মনের মধ্যে কথাগুলো বলে নিলাম। কিন্তু এবার মায়া আমার থেকে মাত্র হাত দূরে বসে আছে, তার মুখ নীচু করা, হাতে চায়ের কাপ। এর নাম মায়া নয়, মায়া নামটা আমিই রেখেছিলাম, ট্রেনের জানলায় সেই নারী।
ঝুমাদের ঘরে বসে গল্প করছিলাম, তখন রেবা এসে বললো, আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। অবাক হয়ে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে? কেন, আমার সঙ্গে কেন?
—আসুন না!
—কেন, আগে বলো, আমার সঙ্গে আলাপ করার কথা বলছো ে আমি কোনো বিখ্যাত লোক নই, কিছু না!
· বলছি আসুন! একটা মজার ব্যাপার হয়েছে!
বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকেই রেবা হাসতে হাসতে বললো, এই এবার সামনা-সামনি দেখে নাও!
সেই চারজন। দু'জন পুরুষ, দু'জন নারী। বেগমপুর স্টেশনে দু'জন পুরুষের কাছ থেকে আমি জলের গেলাস নিয়েছিলাম, এই দ নারীকে দেখেছিলাম ট্রেনের জানলায়। রেবাও ওদের সঙ্গে ছিল ত আশ্চর্য, রেবাকে আমি লক্ষ্যই করিনি, মায়ার দিকে চোখ পড়ার পর দু'টি মেয়ের দিকে আমি তাকাই নি পর্যন্ত।
রেবা বললো, জানেন, ট্রেনে আসতে আসতে ওরা বলছিল, ওদের বন্ধু, অসিত মজুমদার, তার মতন হুবহু দেখতে একজন লোককে ওরা দেখেছে। সেই লোক যে আপনিই, তা আমি বুঝতে পারি আমি অবশ্য আপনাকে ভালো করে দেখতে পাই নি, পাশ ফেরা অ দেখছিলুম, একটু চেনা-চেনা লেগেছিল—এখন ওদের কথা শুনে বু পারলুম—
আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বুঝতে পারলে? আমাকে সত্যিই

লোকের মতন দেখতে ?

বা বললো, আমি তা কি করে জানবো ? আমি তো আর সেই লোককে দেখিনি !

ক চারজনও অবশ্য 'আরে, কি আশ্চর্য মিল', কিংবা 'সত্যিই দেখলে বাস হয় না' এরকম কিছু বলে লাফিয়ে উঠলো না। মুখে মৃদু স ফুটিয়ে বসে রইলো। চেহারায় মিলের মতন একটা অকিঞ্চিৎকর পার নিয়ে বেশী উত্তেজনা প্রকাশ করা সামাজিক ভদ্রতা নয়। তাছাড়া মাকে অন্য একজনের মতন দেখতে, এ আলোচনা হয়তো আমার পক্ষে তিপদ নাও হতে পারে, ওরা ভেবেছে। এমনকি মায়াও আমার দিকে র সে-রকম ব্যগ্র স্থির দৃষ্টিতে তাকালো না, দু' এক পলক চোখে থ রেখেই মুখ অন্যদিকে সামান্য সরিয়ে নিয়েছে।

া হবেই জানতাম, কিন্তু এত সহজভাবে, একেবারে মনীশকাকার কখানায়, এতটা আশা করিনি। এতটা সহজ কিংবা এমন নাটকীয় গাযোগ না হলেই ভালো হতো। আর একটু খুঁজতে হলে আমি ী হতাম। কিন্তু, এমন সহজে যোগাযোগ হয়েছে বলেই যে আমি াহ হারাবো, তার কোনো মানে নেই।

া ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলো। পুরুষ দু'জনের সঙ্গে মার আগেই আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এবারও তাদের নাম এবং অন্য টি মেয়ের নাম আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম। আমি স্মৃতিকে াক্রান্ত করতে চাই না। যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আমার কোনো গাযোগ রাখার দরকার নেই, তাদের নাম আমি অযথা মনে রাখতে না। এ পৃথিবীতে আমাকে কে কতটা মনে রেখেছে, আমি তো ন না !

ার নাম বলার আগে আমার চোখে-মুখে একটা অধীর উৎকণ্ঠা ফুটে ছিল। এর নাম কি সত্যিই মায়া হবে ? আমি এই নাম রেখেছি। টা কি মিল থাকা সম্ভব ? কিছুতেই সম্ভব নয় ?

মেয়েটির নাম সুস্মিতা। সুস্মিতা সান্যাল। সত্যি কথা বলতে আমি একটু নিরাশ হলুম। সুস্মিতা নামটি মোটেই খারাপ নয়, রও অনেক মেয়েকেই এ নামে মানাতো, কিন্তু এই মেয়েটির নাম মায়া ১ পারতো না ? যাই হোক, আমি একে মায়া বলেই ডাকবো। তে মনে মনে।

মায়া (সুস্মিতা) আমার সম্পর্কে কোনো রকম উৎসাহ প্রকাশ করা না, একটা ভদ্রতার নমস্কার করে রেবাকে বললো, রেবা, বেরুবি নাকি ?

রেবা বললো, না ভাই, আজ আর বেরুবো না। অনেকদিন বাদে এল শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সঙ্গে একটু কথা না বললে—। কথা বলতে বল রেবা ওদের একজন পুরুষের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলুম, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই রেবার প্র ঘনীভূত হয়েছে, বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে। তার সামনে পুরোনো শ্বশ শ্বাশুড়ির উল্লেখ করে রেবা একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। ছেলেটি বি হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে।

বাকি পুরুষ ও মহিলাটি স্বামী-স্ত্রী। বসে থাকার ভঙ্গি দেখলেই বো যায়। তাহলে মায়া (সুস্মিতা) কার ? ওর মাথায় সিঁদুর নে মায়া আমার। যেমনভাবে শিমুলতলার বাগানবাড়িটা আমার ছিল। রেবা আর মায়া (সুস্মিতা) এম. এড্. পড়ার সময় হস্টেলে এক থাকতো, তাই ওদের তুই-তুই সম্পর্ক। তা হলে রেবার কাছ থেকে মায়ার সম্পর্কে অনেক কথা জেনে নেওয়া যাবে। মায়া আমার চো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিছুতেই চোখে চোখ রাখছে না। নি আছে, ব্যস্ততার কিছুই নেই। মায়া, তুমি আমার। আমাকে চিন পারছো না ? ট্রেনের জানালা থেকে আমাকে ব্যাকুলভাবে খুঁজেছি তেমনভাবে কোনো নারী আমাকে আগে কখনো খোঁজে নি। এ চোখের সামনে আমি রয়েছি, তুমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন ? যাই হো ব্যস্ততার কিছু নেই।

একজন পুরুষকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি আসানসোলে বেড় এসেছেন ?

লোকটি উত্তরটা এড়িয়ে গেল। এলোমেলো ভাবে বললো, না, এমনি এসেছি·····আসানসোলটা কি আর বেড়াবার মতন জায়গা ভাবছি এখান থেকে বরাকরে যাবো—

—বরাকরে যাবেন ? ওখানে বেশ সুন্দর একটা ডাক বাংলো আ আপনারা যদি যান, আমি এখান থেকে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা করি দিতে পারি। বেশ সুন্দর, একেবারে নদীর ওপরেই—

—না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। বরাকরে আমাদের এক বন্ধ

একটা বাড়ি আছে, তা ছাড়া এখনো কিছু ঠিক করিনি, বরাকরে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত অন্য কোথাও যেতে পারি হয়তো। আপনি আসানসোলে এসেছেন—

আমার কোনো সাহায্য ওরা নিতে চায় না। বেগমপুর স্টেশনে এই দু'জন লোক যখন আমাকে অসিত মজুমদার বলে ভুল করেছিল, তখন বেশ উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিল আমার সঙ্গে, আমিই বরং ওদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। এখন ওরা নিরুত্তাপ। ওদের অন্যান্য কথাবার্তা শুনে আমি আঁচ করলাম, রেবাই ওদের মূল আকর্ষণ। রেবা তার শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের কথা বলবে, তার কি প্রতিক্রিয়া হয়—সেটাই ওরা সব বন্ধু-বান্ধব মিলে দেখতে এসেছে। এমন কি রেবার সঙ্গে ঐ ছেলেটির হয়তো ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রীও হয়ে গেছে। রেবা যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করে সেই জন্যই ওরা এসেছে মনের জোর জোগাতে, এমনকি প্রেমিকটি পর্যন্ত। এখানে ব্যাপারটা ভালোয়-ভালোয় চুকে গেলে ওরা এক সঙ্গে কোথাও যাবে আনন্দ করতে।

আমাকে ওরা দলে নিতে পারে না? না. আমার সামনে ওরা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। ওদের চোখে আমি রেবার শ্বশুরবাড়ির লোক, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত শত্রুপক্ষের। আসানসোল থেকে ওরা ঠিক কোথায় যাবে, সে কথাও ওরা আমাকে জানাতে চায় না। অসিত মজুমদার হলে তাকে ওরা নিশ্চয়ই সঙ্গে নিত। এখানে আমিই তো এখন সে।

হঠাৎ সরাসরি মায়ার (সুস্মিতার) দিকে ফিরে আমি বললুম, আপনাকে আমি এর আগে অনেকবার দেখেছি। আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—আনোয়ার শা রোডে।

—না, ওদিকে অবশ্য আমি বেশী যাই না। অন্য কোথাও দেখেছি।

—হতে পারে।

—আপনি কোন্ কলেজে পড়ান?

—আমি তো কোনো কলেজে পড়াই না!

—তা হলে কোথায়?

আমি কিছুই করি না।

রেবার সঙ্গে এম. এড্. পড়তো বলেই আমি আন্দাজে কলেজে পড়াবার ব্যাপারটা বলেছিলাম। মেয়েরা এম. এ. টেম-এ পাশ করে কলেজে কিংবা

ইস্কুলেই তো চাকরি করে। এর তা হলে শখের পড়া! মায়া আমার কথার কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছে। ব্যস্ততার কিছু নেই।
আমি হেসে বললাম, এবার মনে পড়েছে আপনাকে কোথায় দেখেছি। গঙ্গার ধারে জেটির কাছটায় একদিন সন্ধেবেলা, এই তিন চার মাস আগে, আমি ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছিলাম, আপনি সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলেন, একটু রাগের সঙ্গে বললেন, বাঃ, বেশ, তো! তুমি কখন এদিকে চলে এলে? আমি ওদিকে খুঁজছি······। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, আপনি আরও একটু কাছে এসে থতমত খেয়ে বললেন, ওঃ, আই অ্যাম সরি, এক্সট্রিমলি সরি, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, আমি অন্য একজন ভেবেছিলাম, সত্যি খুব ভুল করেছিলাম! —আপনি লজ্জা পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন জেটির দিকে। আমার পাশে একটি মেয়ে ছিল, তাকে আমি কিছুতেই আর বোঝাতে পারি না, যে সত্যিই আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই। সত্যি, আপনি আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছিলেন। আমার পাশে মেয়েটিকে দেখে আপনি অভিনয় করে চলে যান নি। সেদিন যা মুস্কিলে ফেলেছিলেন আমাকে
মায়া (সুস্মিতা) আমার সব কথাটা আগে মন দিয়ে শুনলো। তারপর হাসলো। এক একজনের হাসি শুধু ঠোঁটে থাকে না, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি হাতের আঙুলে, কিংবা শাড়ীর আঁচলেও সেই হাসির চিহ্ন থাকে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে যখন আলো জ্বলে, মায়ার হাসিটা সেই রকম। এই হাসি দেখলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।
মায়া (সুস্মিতা) হাসতে হাসতে বললো, সেই মেয়েটি যেমন আপনাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছিল, আপনিও আমাকে সেই রকম ভুল করছেন। সে-ও অন্য মেয়ে। তিন চার মাস কেন, গত দু' বছরের মধ্যে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাইনি।
আমি কৃত্রিম বিস্ময়ে বললাম, সত্যি আপনি নন! অথচ মুখটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এমন কি শাড়ীর রং পর্যন্ত আপনি একটা হাল্কা লেমন ইয়োলো রঙের সিল্কের শাড়ী পড়েছিলেন, খুব সুন্দর মানিয়েছিল—
মায়ার মুখের হাসি এখনো মিলিয়ে যায়নি। বললো, হাল্কা লেমন ইয়োলো রঙের শাড়ী আমার নেই, কোনোদিনও ছিল না। তবে আপনি

যখন বলছেন, আমার মত চেহারায় ঐ রংটা মানায়, তখন একটা কিনতে হবে।

রেবা বললো, জ্যোতিদা, আপনি দারুণ চালু হয়েছেন তো। সত্যি, আপনাকে দেখে বিশ্বাসই করা যায় না। এই তো ক'দিন আগে আপনি কি দারুণ লাজুক ছিলেন। মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলতে পারতেন না—

হিমানীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বড় ভালোবাসতাম তাকে। তা বলে আমি এটা চাই না যে, তার স্ত্রী রেবা চিরকাল শুকনো বিধবা হয়ে থাকুক। রেবা বড় ছটফটে মেয়ে, বিষণ্ণতা তাকে মানায় না। রেবা কি জানে যে ওর বিয়ে করার ব্যাপারে আমি গভীর সমর্থন জানিয়ে রেখেছি মনে মনে। আমি ওদেরই দলে।

—আমি বললাম, বাঃ, তুমি চালু হতে পারো, আর আমি পারি না?

—আমি মোটেই আপনার মতন লাজুক ছিলাম না। জানিস সুস্মিতা, জ্যোতিদা আগে মেয়েদের দেখলেই মাথা নীচু করে থাকতেন। লক্ষ্মণের মতন শুধু মেয়েদের পা দেখতেন। আমার সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতেন না।

—বাজে কথা বলো না।

—মোটেই বাজে কথা না! আপনি নিজেকে এরকম বদলালেন কি করে? মায়া এখনো হাসছে। যাক নিশ্চিন্ত।

ঘরের অন্যদের দিকে তাকিয়ে আমি এবার একটু বেশী উৎসাহের সঙ্গে বললাম, কাল আপনারা সবাই কি করছেন? আসুন, কাল এক সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম করা যাক। আমার কাল কোনো কাজ নেই। রেবা, কি বলো?

একজন পুরুষ বিরসভাবে বললো, কাল বিকেলবেলা আমরা একটা ম্যাজিক শো দেখতে যাচ্ছি সবাই মিলে! পি. সি. সরকারের একটা টিম এসেছে।

—ম্যাজিক দেখে কি করবেন? তার চেয়ে চলুন, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক। বার্নপুরে একটা পার্ক হয়েছে, নদীর ধারে ভারি সুন্দর—ওখানে যদি খাবার-দাবার নিয়ে যাই—

—কিন্তু আমাদের আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে। গতকাল সন্ধেবেলাই বেড়াতে বেড়াতে ম্যাজিকের ব্যাপারটা দেখে—

আমি বললাম, পি. সি. সরকারের ম্যাজিক কলকাতায় না দেখে এই

আসানসোলে দেখবেন ? ও আর দেখার কি আছে ?
একজন পুরুষ বললো, বাইরে এসেই এরকম অনেক জিনিস দেখতে খুব খারাপ লাগে না। বাইরে এসে আমরা এমন অনেক সিনেমা দেখি, কলকাতায় যা দেখার কথা ভাবতেই পারি না। দার্জিলিং-এ দেখেছিলাম যাদু কি চিড়াগ…
আমি অত্যন্ত ক্যাডের মতন ওদের দলে জোর করে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করছি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তবু, দেখাই যাক না, কতদূর যাওয়া যায়। মায়া কি বুঝতে পারবে না, সবই ওর জন্য ? আমি আমার বিগলিত মুখে পুরুষটিকে (প্রথমে মনে মনে বললাম, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের শত্রু নই, আমি রেবার বিয়েতে যথাসাধ্য সাহায্য করবো) মুখে বললাম, তা হলে অ্যালাউ মি, রেবার অনারে আমিই ম্যাজিক শো-এর টিকিটগুলো কাটবো।
পুরুষটি বললো, ইস, চান্সটা মিস করলাম। আমাদের যে পাঁচটা টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আজই আসবার পথে কেটে আনলাম।
এবার হতাশায় আমার ভেঙে পড়ার কথা। ওদের সঙ্গে যাবার কোনো সুযোগই নেই আমার। আমি যদি এর পর নিজের জন্য আলাদা টিকিট কাটি, তাহলেও ওদের সঙ্গে বসতে পারবো না। আলাদা ভাবে দূরে বসে আমি ম্যাজিক দেখছি, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। পাঁচজন সুস্থ নারী পুরুষ কলকাতার বাইরে এসে ম্যাজিক দেখার প্ল্যান করেছে—এটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।
আমি মায়ার দিকে ফিরে বললাম, আপনার ম্যাজিক দেখতে ভালো লাগে বুঝি ?
—খুব।
—আজকাল তো ম্যাজিক দেখলে সবই বোঝা যায়। সবই যন্ত্রপাতি।
—আমি একটাও বুঝতে পারি না। আমার দারুণ অবাক লাগে।
চকিতে একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল। চার্লি চ্যাপলিনের আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম। একটা পরীক্ষা। সেটা করে দেখলে কেমন হয়! আর বেশী কিছু না ভেবেই আমি বলে ফেললাম, ম্যাজিক দেখানো তো খুব সোজা। আমিও অনেক ম্যাজিক জানি।
রেবা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, জ্যোতিদা! আপনি কি বলছেন কি ?
—বাঃ, আমি অনেক রকম ম্যাজিক জানি না!

—ম্যাজিক ! কবে শিখলেন ? অদ্ভুত সব কাণ্ড দেখছি আজ !
—আমি খুব ভালো হিপ্নোটিজম্ জানি। এক থেকে দশ গোনার মধ্যে তোমাদের যে-কোনো একজনকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারি।
—যান্ যান্ গুল ঝাড়বেন না !
– দেখতে চাও ? এক্ষুণি দেখাতে পারি। কত বাজি ফেলবে বলো ?
—দশ টাকা ! করুন তো আমাকে।
—দশ টাকা ? ঠিক দেবে তো ? সকলের সামনে দিতে হবে। পরে দেবো বললে চলবে না !
দেবো তো বলছি। এক্ষুণি দেবো। সত্যি সত্যি অজ্ঞান করতে হবে।
—নিশ্চয়ই ! সবাই পরীক্ষা করে দেখবে। তারপর যদি আর জ্ঞান না ফেরে, তা হলে কিন্তু আমি জানি না !
ইস্, খুব হয়েছে ! করুন তো আগে !
এই সময় মায়া বললো, রেবাকে নয়, আমাকে করুন। দেখবো তা হলে !
—না, সুস্মিতাকে নয়, আমাকে।
আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, সুস্মিতা দেবী মায়া)-কেই ভালো হবে।
মায়া যে নিজে থেকে রাজী হলো, এটাই কি একটা ম্যাজিক নয় ? আমি তো মায়ার জন্যই হিপ্নোটিজমের কথা তুলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত রেবার বদলে মায়াকেই আমি চেষ্টা করতাম। মায়া নিজে থেকে এগিয়ে এলো, এটাই আমার প্রথম জয়।
আমি বললুম, সুস্মিতা দেবী (মায়া), আপনি ওপাশের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান। আমি দশ গুণবো –
রেবা বললো, আবার দেবী-টেবী কি, আপনি শুধু সুস্মিতা বলুন !
আমি মনে মনে বললুম, শুধু মায়া বললেই হয় না ? সুস্মিতাই বা কেন ? রেবাকে বললাম, রেবা, ঘরের আলোটা নিবিয়ে শুধু টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বালো। তোমরা সবাই উঠে এপাশের দেয়ালের কাছে চলে এসো। সুস্মিতার (মায়ার) দশ গজের মধ্যে কেউ থাকবে না।
—জ্যোতিদা, না পারলে দেখিয়ে দেবো মজা ! শুধু ধুধু ইয়ার্কি করলে কিন্তু—
—আঃ, কথা বলো না ! সুস্মিতা, আপনি আমার দিকে সোজাসুজি

াকান, ভয়ের কিছু নেই—আমার চোখে চোখ রাখুন, এখন অন্য আর
ছু ভাববেন না—
য়া (সুস্মিতা) ওপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললো,
ন্য কিছু ভাববো না মানে ? কি ভাববো, তা হলে ?
-শুধু আমার কথা ভাবুন।
বাঃ, হলের মধ্যে হিপ্নোটিজমের সময় সবাই বুঝি শুধু ম্যাজিসিয়ানের
থা ভাবে ? তা ছাড়া, আপনার কথা আমি কি ভাববো ?
ঠিক আছে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন শুধু, চোখ ফেরাবেন
। না, না, মুখটা ওরকম নয়—
ামি মায়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। আমি
ি পারবো ? চার্লি চ্যাপলিনের মতন বড় অভিনেতা পারেন। আমি
ীবনে কখনো অভিনয় করিনি। অনেক বৈঠকখানার আড্ডায় এক
কজন লোক থাকে, যারা সর্বক্ষণ বাজে রসিকতা করে অন্যদের হাসাবার
ষ্টা করে, পারে না, অন্যরা বিরক্ত হয়, আড়ালে হাই তোলে, আমিও
ই ভূমিকায় নেমেছি ? কিন্তু আমাকে পারতেই হবে।
ামি মায়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে এক আঙুল আলতোভাবে তার
তনিটা তুলে দিলাম। অন্যদের একেবারে আড়াল করে, একেবারে
য়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমার নাকে আসছে ওর প্রসাধনের ঘ্রাণ,
ামার আঙুলের ডগায় ওর শরীরের উত্তাপ। ওকে বললাম, ঠিক এই
কম সোজাভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন—আমি এক পা এক পা
রে ঠিক দশ পা পেছিয়ে যাবো, তারপর দশ গুনবো—এর মধ্যে চোখ
াবেন না—। সঙ্গে সঙ্গে আমি খুব নীচু গলায়, চোখে মিনতি এনে
লাম, ভান করবেন, প্লিজ ভান করবেন…। এক পা এক পা করে
িছিয়ে আমি গুনতে লাগলাম ঃ
ক ! (মায়া, আমি আঙুল দিয়ে তোমার শরীর ছুঁয়েছি, তোমার
ছে সারা জীবনের মতন আমি কৃতজ্ঞ !)
ই ! (মায়া, আমাকে দেখো, চিনতে পারছো না ?)
ন ! (মায়া, তুমি আমার হৃৎপিণ্ডটা চাও ? এক্ষুণি উপড়ে এনে
তে পারি !
র ! (মায়া, কথা রাখবে না ?)
চ ! (মায়া, কথা রাখবে না ?)

ছয়! (মায়া, চোখ সরিও না)
সাত!
আট!
নয়!
দশ গোনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার চোখ বুজে গেল, ঘাড় হেলে পড়লো এ
পাশে। ঘরের সবাই চুপ। রেবা এ পাশ থেকে ডাকলো সুস্মিতা
এই সুস্মিতা!
কোনো সাড়া নেই। আমি তখনও ম্যাজিসিয়ানের মতন দু' হাত তু
দাঁড়িয়ে আছি। রেবার দিকে ফিরে বললাম, দেখলে, পারি কিনা
এবার তোমাকে করবো?
একজন পুরুষ জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো? সুস্মিতা ওরকমভা
দাঁড়িয়ে আছে কেন?
আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই, এমনিই অজ্ঞান হয়ে গেছে!
লোকটি সরাসরি আমার সঙ্গে কথা না বলে ডাকলো, সুস্মিতা, ি
হয়েছে তোমার?
সুস্মিতা কোনো জবাব দিল না। চোখ বুজে ঘাড় হেলিয়ে সেই রক
ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।
আমার মুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি। আমি পেরেছি। একেই বে
হিপ্নোটিজম্ বলে—আমি যা বলেছি, মায়া তাই শুনেছে। আমি ও
ভান করতে বলেছিলাম, ও করেছে।
রেবা জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি? দাঁড়ি
দাঁড়িয়ে? যাঃ!
আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি আবার এক্ষুণি ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনছি
কিন্তু রেবা আমাকে সে সুযোগ দিল না। আমি দ্বিতীয়বার অ
মায়ার চিবুক ছুঁতে পারলুম না।
রেবা উৎকণ্ঠিতভাবে এগিয়ে গেল মায়ার দিকে। মাথায় হাত দি
ডাকলো, এই সুস্মিতা, সুস্মিতা!
মায়া চোখ মেলে, ঘাড় সোজা করলো, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি।
রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, তুই সত্যি সত্যি অজ্ঞান হ
গিয়েছিলি?
—হয়েছিলুম নাকি?

—তবে ? তবে ওরকম করলি কেন ?
ায়া সেই হাসিটুকু বজায় রেখে বললো, কি জানি অজ্ঞান হয়েছিলুম
কনা ? তবে এত দেরী লাগছিল, আমি বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে
ুমিয়ে পড়েছিলুম !
—দেরী তো হয়নি বেশী !
—চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে
িচ্ছিল এক যুগ কেটে গেছে !
মামি ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, ধপ্ করে চেয়ারে বসে
াড়লাম। আনন্দও লাগছে খুব। এই পরীক্ষাতেও আমি দৈবাৎ
াফল হয়েছি। মনে মনে বললাম, চোখের মধ্যে দিয়ে আমি যে বাণী
াঠিয়েছি, মায়া, তা তোমার মর্মে পেঁছেচে তো ?
ারের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো। পুরুষ দু'জন এবং
মন্য মেয়েটিও আরও কিছু কথা বলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিকে আমি
মার মন দিইনি। সে-সব কথার কিছুই মনে রাখিনি। স্মৃতির মধ্যে
াকটা খোলামেলা ভাব রাখার জন্য আমি বেশী কিছু ঢোকাতে চাই না।
ঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সারা দিনের জন্য ট্যাক্সিটা ভাড়া করার সুফল এখন
পলাম। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। সুস্মিতারা বাড়ি ফেরার
াস্তাব করতেই আমি বললাম, আমি ওদের বাড়ি পেঁছে দিতে পারি।
ামার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে দেখে, ওরা অবাক।
ুমন্ত ড্রাইভারকে আমি ডেকে তুললাম। ওরা হয়তো ভাবলো, আমিই
্যাক্সির মালিক। তা ভাবুক। এ ছাড়া, আর কোনো উপায়ে কি আমি
ায়ার বাড়ি দেখে আসতে পাবতাম ? ওদের অনুসরণ করা তো সম্ভব
হল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবার সময় মায়া শুধু হাত জোড় করে
ামাকে বললো, আচ্ছা—। আর একটি কথাও না। বাকি তিনজনও
িশ্চয়ই কিছু বলেছিল, আমি মনে রাখিনি ! বস্তুত, তারাই বেশী কথা
লেছিল, মায়া শুধু বলেছে, আচ্ছা—। সেই আচ্ছা কথাটার অনেক
ানে আছে আমার কাছে।
াত্রে হোটেলে ফিরে আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দশ টাকা বকশিস্ দিলাম।
াকটি কেন জানি না আমার ওপর খুশী নয়। টাকাটা নিল বটে, কিন্তু
াকটুও কৃতার্থ হবার ভাব দেখালো না। আমি ওকে আরও দশ টাকা
িলাম ! এবারও টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরলো, একটিও অতিরিক্ত নমস্কার

নয়। তখন আমি ঠাণ্ডা গলায় তাকে বললাম, কালকেও আমি সারা দিনের জন্য তোমার গাড়ি চাই। সকালবেলা এখানে আসবে।
—আবার কাল ?
—হ্যাঁ, ঠিক সকাল ন'টার সময় এখানে এসে দাঁড়াবে। কাঁটায় কাঁটায়, এক মিনিটও দেরী আমার সহ্য হয় না।
—স্যার, আপনার হোটেলের সামনেই তো চার পাঁচখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে যে-কোনো সময়ে ডাকলেই পেয়ে যাবেন।
—না, আমার সারা দিনের জন্য গাড়ি চাই। তোমাকে আমি অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি।
লোকটার চোখে চোখ রেখে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। কেন লোকটাকে দমন করার জেদ আমাকে পেয়ে বসেছে, আমি জানি না। যে-কোন কারণেই হোক, লোকটা আমার কাছে বাঁধা থাকতে চায় না। একটা ট্যাক্সিতে আট দশজন প্যাসেঞ্জার চাপিয়ে হৈ-হল্লা করে এখানে-সেখানে যাবে, এই সব কাজই ওর পছন্দ, আমার জন্য ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে ওর ভালো লাগছে না বোধহয়। কিন্তু ওকেই আমার চাই। আমি একটু আগে হিপ্নটিজমের খেলা দেখিয়ে এলুম, আর ওকে আমার ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে বশ করতে পারবো না ? পারতেই হবে।
আমার ইচ্ছা-শক্তির কাছে হার মানলো কিংবা অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারলো না—লোকটি আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মিনমিনে গলায় বললো, আচ্ছা স্যার, কাল ঠিক ন'টার সময় আসবো। সন্ধ্যের দিকে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।

ওপরে উঠে দেখলাম, আমার ঘরের সামনে বেচু চুপটি করে বসে আছে। বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল, আমাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কি রে, তুই এখানে কি করছিস ?

ঘুমচোখে বিগলিত হাস্যে বেচু বললো, আপনার যদি কিছু দরকার-টরকার হয় —

আমার হঠাৎ খুব লজ্জা করলো। আমি ওকে একটা জামা কিনে দিয়েছি বলে প্রতিদান হিসেবে ও আমার কিছু সেবা করতে চায়! সামান্য একটা দশ টাকার জামা! সকাল থেকে খাটতে দেখেছি ছেলেটাকে, রাত দশটার সময়েও ছুটি নেই।

আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে আন্তরিকভাবে বললুম, আমার কিছু লাগবে না! যা, তোর এখন ছুটি। শুয়ে পড়গে—
কাঁধে হাত রাখতে ছেলেটা যেন একটু কুঁকড়ে গেল। পিছলে সরে গেল দূরে। কি জানি ও আমাকে কি ভাবছে! আমি আজ নিজেই নিজের সম্পর্কে কি ভাবছি, তাই তো বুঝতে পারছি না। একদিনে এত উল্টো-পাল্টা রকমের কাজ জীবনে কখনো করিনি! তবে, বেশ লাগছে কিন্তু। আজ যেন আমি সত্যিকারের স্বাধীন। যখন যা মনে আসছে, ঠিক সেই রকম ব্যবহার করে বেঁচে থাকা - এর একটা অন্য রকম আরাম আছে। মানুষ এরকম পারে না, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের একটা ধরা-বাঁধা ছক আছে। কিন্তু যদি কেউ ব্যক্তিত্ব বদল করতে চায়?

॥ ৬ ॥

ব্যক্তিত্ব বদল করতে চাইলেও স্বভাব অবশ্য সহজে বদলানো যায় না। সকালবেলা দাড়ি কামাবার সময় গরম জল ব্যবহাব করা আমার বহুদিনের অভ্যেস। বাড়িতে গরম জল পেতে এক একদিন অসুবিধে হয়, হোটেলে তো অসুবিধের কোনো প্রশ্নই নেই, পয়সা দিয়ে যে কোনো কিছু হুকুম করা যায়। কিন্তু এই হোটেলে আর বেশী কিছু হুকুম করবো না স্থির করেছি। ফাই ফরমাস খাটার জন্য এই হোটেলে তো ঐ একটা ছেলে, বেচু। ওকে কিছু বললেই ও এখন এমন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে যে অস্বস্তি লাগছে আমার। ওকে একটা জামা কিনে দেবার বিনিময়ে যে আমি কিছুই চাই না, এটা ওকে বোঝাবো কি করে? জামাটা ওকে প্রথমেই না কিনে দিয়ে যাবার সময় দিয়ে গেলেই হতো। তবে, সেটা ভেবে-চিন্তে হিসেব করা কাজ।
গরমকালেও দাড়ি কামাবার সময় আমার গরম জল লাগে। আমার গালের ঐ রকম অভ্যেস। কলের জল দিয়ে দাড়ি কামাতে গিয়ে কি রকম যেন নোংরা নোংরা লাগছে, মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রথম থেকেই। তবু আমি উল্টো দিক থেকে একশো গুনে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলুম। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এই রকম জলে দাড়ি

কামাচ্ছে রোজ, আমি কেন পারবো না ? এ ধরনের শৌখিনতার সত্যিই কোনো মানে হয় না। জীবনটা পাল্টাতে চাই—তার মানে আমি আলাদা অদ্ভুত কিছু হতে চাই না—বরং আমার এখনকার ছোটখাটো ত্রুটি ও ব্যর্থতাগুলো শুধরে কোনো মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া দরকার ! প্রত্যেক মানুষই তার জীবনটাকে একটু উঁচুতে ওঠাতে চায়। যেখানে আছে, তার থেকে উঁচুতে। পাহাড়ের ওপর সাতাশ হাজার ফিট ওঠার পর এমনিতেই নাকি মানুষের মন থেকে লোভ, ঈর্ষা, নীচতা দূর হয়ে যায় ?
মাখন-মাখানো ঠান্ডা টোস্ট দেখলেই আমার গা ঘিন ঘিন করে। আমি চাই গরম গরম টোস্ট দিয়ে যাবে, মাখন আলাদা থাকবে। আমি ইচ্ছে মতন মাখন লাগিয়ে নেবো, মচমচে টোস্ট হলে না-ও লাগাতে পারি। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেবার পরই ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছিল, ঝাল না চিনি টোস্ট হবে ? আমি বলেছিলাম, ঝাল বা চিনি কোনোটাই নয়। হাফ বয়েল ডিমের সঙ্গে টোস্ট আর মাখন। এনেছে সেই মাখন মাখিয়ে সেঁকা রুটি, তাও স্যাঁৎসেতে, ডিম দুটো বেশী সেদ্ধ—কড়াপাক সন্দেশের মতন। কামড়ালে কুসুম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে।
আমি কি রাগ করে প্লেটটা ঠেলে ফেলে দিতে পারতাম না ? কড়া গলায় চেঁচিয়ে বলতে পারতাম না, এসব কে চেয়েছে ? এ তো কুকুরের খাবার ! তা বলিনি ! কুকুরের মতই সোনা সোনা মুখ করে ঐ অখাদ্য খাবার খাচ্ছিলাম। না, কারুকে বকবো না ঠিক করেছি।
ইস্, ছি ছি, নেপালের একটা হোটেলে একবার খাবারের ব্যাপার নিয়ে কি চেঁচামেচিই না করেছিলাম ! হোটেলওয়ালারা সব সময় চেষ্টা করে বেশী পয়সা আদায় করতে, আমরাও চাই পুরো পয়সা উসল করে নিতে—মাঝখানে উহ্য থাকে মনুষ্যত্ব—দু'জন মানুষে মানুষে যে আদান-প্রদান হচ্ছে, সেটা মনে থাকে না। অথচ দেঁতো হাসি আর মিষ্টি-মিষ্টি ইংরেজি-বাংলা বাক্যের বিনিময় হয় ঠিকই। এতকাল হোটেলে এসে বেয়ারাদের শুধু বেয়ারা জাতীয় জীব হিসেবেই দেখেছি, যাদের কাজ শুধু হুকুম তামিল করা, তারা যে মানুষও, এটা ভাবিনি।
রামভক্ত হনুমানের মতন বেচু দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বাকি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, এই, বোস্ ওখানে ! বেচু লজ্জায় সারা শরীরটা মোচড়ালো শুধু। আমি ওকে ফের ধমক দিয়ে বললাম, এই, বসতে বলছি, বোস্ না ! দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

বেচু কোনো কথা বললো না। আমাকে বোধহয় ও একটা আধপাগলা লোক ভেবেছে। সুতরাং এ ধরনের অদ্ভুত কথার উত্তর দেবার দরকার নেই।

আঃ, এই অদ্ভুত নিয়ম আর কতদিন চলবে? আমি চেয়ারে বসে বসে হুকুম করবো, আর একটা চেয়ার খালি থাকলেও মজুর বা চাকর শ্রেণীর কেউ সেখানে বসবে না! মানুষ সব সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চায়, সাড়ে তিন হাত জমিতে তার কুলিয়ে যেত, তবু সে বিশাল বাড়ি বানায়। শরীরের চেয়েও তার মনের জন্য অনেকটা বেশী জায়গা দরকার। কিন্তু এই বেশীরও তো একটা সীমা আছে! আরাম তখনই উপভোগ করা যায় সবচেয়ে বেশী, যখন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় আর কেউ সে-জন্য কষ্ট পাচ্ছে না।

আমার ইচ্ছে করলো তড়াক্ করে উঠে বেচুকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিই। এবং ওকে শাসিয়ে বলি, খবর্দার, এর পর থেকে আর কখনো খালি জায়গা ছাড়বি না। যখন কাজ থাকবে না, তখন দাঁড়িয়ে থাকার বদলে যদি বসতে ইচ্ছে হয়, কাছাকাছি বসার জায়গা পেলে বসে পড়বি। কিন্তু জানি, এ ভাবে বলে কোনো লাভ নেই। ও আরও ভয় পেয়ে যাবে। ওদের কি ভাবে সচেতন করতে হয়, সে ভাষা আমার জানা নেই! জানতে ইচ্ছে করে, যারা খুব বড় বড় জন-দরদী নেতা, তাদের বাড়িতেও ঠাকুর-চাকর আছে কিনা। থাকলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা হয়। কিংবা ঠাকুর-চাকররা বোধহয় জনগণ নয়, যারা দূরে থাকে, যাদের দেখা যায় না—তারাই শুধু জনগণ!

যদিও এটা খুবই সামান্য ব্যাপার, তবু এ নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন জানি না! খালি মনে হচ্ছে, অনেক মানুষকেই আমি এতদিন মানুষ বলে গ্রাহ্য করিনি, আজ থেকে সেটা শুরু করা দরকার। বেচুর মতন মানুষের সঙ্গেও আমার আত্মীয়তা আছে। কিন্তু কি করে কাছাকাছি আসা যায়, আমি তা জানি না।

—এই, তোর বাড়িতে আর কে কে আছে?

—বাবা, মা, ভাই-বোন।

—বাবা কি করে?

—কিছু করে না। আগে রেলে কাজ করতো—

একটা কিছু দুর্ঘটনা কিংবা দুঃখের কথা বলবে। না, না, ওটা আমি

শুনতে চাই না ! এ তো জানা কথাই, প্রায় একটা ফর্মুলার মতন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, তুই লেখাপড়া জানিস্ একটুও ? ইস্কুলে পড়েছিস্ কখনো ?

নোখ খুঁটতে খুঁটতে বেচু বললো, না—

—তোরা ক' ভাই বোন ?

—আমরা আট বোন, পাঁচ ভাই।

—অ্যাঁ ?

আর একটু হলেই আমি হেসে ফেলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সেটা ব্যাড টেস্টের পরিচয় হতো। কিন্তু আচমকা এ রকম শুনে হাসি রোধ করা কঠিন। আজকাল এক দম্পতির এতগুলো সন্তানের কথা শোনাই যায় না, অর্থাৎ শহরে বসে আমরা শুনতে পাই না। হয়তো গ্রামের দিকে…বেচুর বাবার ওপর খুব রাগ হলো। একটা অপদার্থ লোক, চাকরি নেই, তাও এতগুলো……।

রবীন্দ্রনাথরাও একুশ না বাইশজন ভাই বোন ছিলেন না ? দেবেন ঠাকুর ঠিক সময় ফ্যামিলি প্ল্যানিং করলে রবীন্দ্রনাথ তো দূরের কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও বাংলা দেশ চোখে দেখতে হত না। কিন্তু অতগুলো ছেলে-মেয়ে মানুষ করার সাধ্য ছিল দেবেন ঠাকুরের, ধর্ম করেছেন, আর জমিদারিও বাড়িয়েছেন—সেকালের পক্ষে ভালো লোক ছিলেন। আমাদের দেশে কোনো হদ্দ গরীবের বংশে বেশী ছেলেপুলে হলে তাদের মধ্যে একজনও তো ম্যাকসিম্ গোর্কি কিংবা আব্রাহাম লিংকন হয় না—সব চায়ের দোকানের বয় কিংবা বাজারের তরকারিওয়ালা কিংবা চোর ডাকাত—

—বাবু, আমি এবার যাবো ? নীচে কাজ আছে।

—আচ্ছা যাও।

যাওয়াই ভালো। ওর সঙ্গে কথা বললে আরও কত কি অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে কে জানে ! মারল্‌বরো অ্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জি কম্পানির রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি, কম্পানি আমাকে পাঠিয়েছে একটা জরুরি কাজে—আমার কি এখন বসে বসে গরীব লোকের ক'টা ছেলে মেয়ে হওয়া উচিত, এসব কথা ভাবা উচিত ! এর আগে আর যতবার টুরে বেরিয়েছি, অবসর সময়টায় হোটেলে শুয়ে শুয়ে ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ে কাটিয়েছি। এবার সব অন্যরকম।

ন'টার সময় ট্যাক্সিটা ঠিক এসে হর্ন দিল। আমি জানলা থেকে তাকে হাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। ট্যাক্সিটা যখন আছেই তখন অফিসেরই একটা কম জরুরি কাজ সেরে ফেলা যাক্। ধানবাদে মিঃ চোপরার সঙ্গেও একটা বিজনেস-ডিল হওয়ার কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। আগামী সপ্তাহে মিঃ চোপরার কলকাতায় যাওয়ার কথা, তখনই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে—কিন্তু আগে থেকে দেখা করলে দোষ কি?

কালীপাহাড়ীর মিঃ নাগের মতন মিঃ চোপরা অত বেশী ফর্মাল কিংবা সাহেবী নন্। বেশ খোলামেলা হাসি-খুশী মানুষ—ব্যবসার জ্ঞানটি যদিও টনটনে, কিন্তু ব্যবসা ছাড়া অন্য বিষয়েও কথা বলতে জানে। আগেরবার মিঃ চোপরার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে শিকার বিষয়ে কথা হয়েছিল, ওর খুব শিকারের শখ। আমি যদিও জন্মে কখনো শিকারে যাইনি, কিন্তু গল্প করতে দোষ কি! বাংলা কয়েকখানি শিকারের বই তো পড়াই আছে—তাছাড়া কেনেথ অ্যাণ্ডারসনের একটা শিকারের গল্প বেশ চালিয়ে দিলাম—জিম করবেটের গল্প বলিনি, তাহলে চোপরা হয়তো ধরে ফেলতো!

এবারের টুর প্রোগ্রামে চোপরার সঙ্গে অবশ্য দেখা করার কোনো কথাই ছিল না। কালীপাহাড়ীতেই আমার দু' তিন দিন লাগার কথা, সেটা কালই শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি কলকাতায় ফিরে যেতেও পারি! কিন্তু তা অসম্ভব। যাই হোক, কিছুটা সময় অন্তত অফিসের কাজ করা যাক্, অফিসের টাকাতেই এসেছি যখন। অন্য ব্যক্তিত্ব নিতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, মাঝে মাঝে এক একবার নিজের সত্তায় ফিরে আসা দরকার।

হোটেল থেকে বেরুতে যাচ্ছি, আবার সেই ঝাঁকড়া গুঁপো ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। জলদস্যু হলে যাকে মানাতো, সে মুখে অতি বিনীত হাসি ফুটিয়ে হোটেলের ম্যানেজারি করছে। অকারণেই জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? যদি কিছু হয়—

লোকটাকে দেখেই কেন যেন আমার রাগ চড়ে যায়, যদিও ও কোনো দোষ করে নি। উত্তর না দিয়ে আমি ওর দিকে শুধু তাকালাম। নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি খুব রুক্ষ হয়েছিল, লোকটি আরও বেশী কাচুমাচু হয়ে গেল। বললো, অসুবিধে হলে বলবেন। বেচুকে শুধু আপনার জন্যই

রেখেছি, ওকে আপনি যখন যা বলবেন—ও আর অন্য কারুর কাজ করবে না—

ওঃ, এই ব্যাপার। বেচুকে যে আমি জামা কিনে দিয়েছি, সেটা নিশ্চয়ই রটে গেছে। আজই এই হোটেল ছাড়তে হবে দেখছি। হোটেলশুদ্ধু সবাই ভাবছে বোধহয় আমি যাবার সময় সবাইকেই প্রচুর বখশিস্ দিয়ে যাবো। এমনকি ম্যানেজারটিও কি ভাবছে, ওকেও কিছু কিনে দিতে পারি আমি? কিন্তু, ওকে সত্যিই যা দেওয়া উচিত, একটা জলদস্যুর পোষাক, তা আমি কোথায় পাবো। তুমি ছদ্মবেশী দস্যু হয়েই থাকো। বিড়বিড় করে বললাম, না, না, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি আজ আগে নিজে থেকেই আমাকে নমস্কার করলো, আমি পাক্কা অফিসারের মতন একটা হাত উঁচু করলাম শুধু অবহেলার সঙ্গে। সে আমাকে দরজা খুলে দিল, ভেতরে বসলাম, পায়ের ওপর পা ক্রস করে। চোখে সান গ্লাস। হাতে ব্রিফ কেস।

ধানবাদ যেতে হবে, সংক্ষেপে এই কথাটা বলে আমি ব্রিফ কেস খুলে কাগজপত্র দেখতে লাগলাম মনোযোগের সঙ্গে। এই ভঙ্গিটার নাম ব্যক্তিত্ব, সাব-অরডিনেট ক্লাস এই সময় কথা বলতে ভয় পায়। বিনা বাক্য-ব্যয়ে ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি চালিয়ে দিল। হু-হু করে ছুটছে ট্যাক্সি, এর মধ্যেই চড় চড় করছে রোদ্দুর, জুলপির কাছে ঘাম জমছে। আমি এখন ঠিক আমার মতন—অন্যান্যবার টুরে এসে যে-রকম ব্যবহার করি।

শহর ছাড়িয়ে কিছু দূরে এসেছে ট্যাক্সিটা, হঠাৎ আমার খেয়াল হলো কেন আমি ধানবাদ যাচ্ছি? অফিস থেকে আমাকে মিঃ চোপরার সঙ্গে দেখা করার কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু এতখানি গরজ আমি দেখাচ্ছি কেন? পার্সোনাল কানেকশান! অফিসে বাহবা পাওয়ার লোভ! জেনারেল ম্যানেজার ম্যাকেঞ্জি জুনিয়ার একবার সস্নেহে আমার দিকে তাকাবে, শুধু সেইটুকু! সবাই বুঝবে আমি কত উদ্যমী! এর ফলে কোনো প্রমোশান অবশ্য হবে না, এত সহজে প্রমোশন কিংবা রেইজ হয় না, শুধু অফিসে একটু ভালো ধারণা সৃষ্টি করা! শুধু এই জন্যই আমি যাচ্ছি মিঃ চোপরার কাছে—চাকরির কারণ ছাড়া ঐরকম কোনো লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হলে আমি মোটেই দ্বিতীয়বার দেখা করার জন্য উৎসাহিত হতাম না, ওর সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই! কেন ওর ড়-মেশানো ইংরিজি আমাকে শুনতে হবে?

আমি তো ছুটি নিয়েছিলাম। নিজের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে অন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তিত্বটা ঠিক কি রকম হবে তা বোঝা খুব সহজ নয়। সেটা ঠিক করতে পারছি না বলেই এরকম ছট-ফটানি।

—রোক্ কে। রোক্ কে! গাড়ি ঘুমাও!

আমি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে ড্রাইভারটি ঝট্ করে ব্রেক কষে ফেললো। কর্কশ আওয়াজ করে থরথরিয়ে কেঁপে থামলো গাড়িটা। একসঙ্গে আট দশজন প্যাসেঞ্জার করে গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ড্রাইভার অত্যন্ত অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি রুক্ষভাবে তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, দেখছো কি, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। বললাম না, নিজেকে সামলে নিলাম।

কাল থেকে এই ট্যাক্সি ড্রাইভারটির কাছে খুব একটা কঠোর ব্যক্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা করছি। অনেক রুক্ষ কথা বলেছি। কিন্তু কি লাভ! মানুষের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করার কোনো মানে হয় না, ঐ রকম ব্যক্তিত্ব আমার মানায় না।

আমি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেললাম। মুখে লজ্জিত হাসি ফুটিয়ে অন্যরকম করে ফেললাম মুখের চেহারা। বললাম, ভাই, আমি একটা জিনিস ফেলে এসেছি, আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে।

লোকটি চাপা দুঃখের সঙ্গে বললো, সে আপনি যা বলবেন!

—তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছি!

—গাড়ি চালাবো, তাতে আর কষ্ট কি?

সে কথা ঠিক, যাকে গাড়ি চালাতেই হবে, সে গাড়ি চালিয়ে ধানবাদ যাক্, কি আসানসোল যাক, তাতে কিছুই যায় আসে না! তবু হঠাৎ গতি পথ পাল্টালে গাড়ির চালকরা একটু অপমানিত বোধ করে! লোকটির মুখে সেই অপমানের বিষাদ।

হোটেলে ফিরে এসে ব্রিফ কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম টেবিলের ওপর। গলার টাইটা এত তাড়াতাড়ি খুলতে গেলাম যে আর একটু হলে ফাঁস লেগে যাচ্ছিল। জুতো-মোজা প্যাণ্ট-সার্ট সব ছেড়ে আমি একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে নিলাম। এই তো ছুটির পোষাক। চটি পায়ে গলিয়ে ধীরে সুস্থে নেমে এলাম আবার।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে শান্তভাবে বললাম, তোমারও আজ ছুটি। আমার

আর কোনো কাজ নেই !
সে সন্দিগ্ধভাবে বললো, ছুটি ? আপনি আট ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়েছেন—
—তা নিয়েছি ঠিকই। কিন্তু আমার আর দরকার নেই। আমি তোমাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি—তুমি আজকের দিনটা বিশ্রাম নিতে পারো—
—না, না, আমি ছুটি নেবো কেন ? আপনি আট ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়েছেন, আমি আট ঘণ্টা থাকবো। আপনার লাগুক বা না লাগুক—এখন না হোক, পরে লাগতে পারে !
এ তো মহা মুস্কিল, একে ছুটি দিলেও নিতে চায় না ! আর বেশী কথা বাড়ালাম না। লোকটা নিশ্চয়ই ডিউটির পর খুব খানিকটা দিশি মদ গিলে হৈ চৈ করে, তখন ওর ব্যক্তিত্ব বদলে যায়, তখন ও ছুটি নেয়।
ট্যাক্সি অপেক্ষা করলে তো আর হেঁটে বেড়ানো যায় না। উঠতেই হলো। কাল রাত্তিরে মায়া (সুস্মিতা) এবং তার সঙ্গীদের যে-বাড়িতে নামিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে চলে এলাম। কি কথা বলবো তা ঠিক করিনি, তবু আমি দ্বিধা না করে সে বাড়ির দরজার বেল টিপলাম।
ওরা কেউ বাড়ি নেই। যাক্, এক হিসেবে বেশ ভালোই হলো। দেখা হলে কি বলতাম ? আবার খুঁজতে না এলে মনে হতো, মায়া আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।
সকালবেলা মনীশকাকা হাসপাতালে ডিউটি দিতে যান, এখনো ফেরেন নি। হাসপাতাল থেকে মনীশকাকা কোনো মাইনে নেন না—এমনিতে তাঁর যথেষ্ট রোজগার, সকাল বেলাটা দাতব্য চিকিৎসা করেন। হিমানীশ মারা যাবার পরই মনীশকাকা হাসপাতালের এই কাজটা নিয়েছেন। তীব্র শোক মানুষকে অনেক সময় উদার এবং মহৎ করে দেয়।
সীমা তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে—এখানে তার অনেক পুরোনো বন্ধু, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ঝুমা বাইরের ঘরে তার বয়েসী দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে বসে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে গান শুনছে। এই বয়েসী কিশোরী মেয়েদের অনেক গোপন কথা থাকে—এখানে ওদের সঙ্গে আমি বসে থাকলে ওরা আড়ষ্ট বোধ করবে। ঝুমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম।
রেবাকে বাড়িতে পাবো না ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সে বাড়িতে আছে। সকালবেলায় সে আর তার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে বেরোয় নি।

আসলে রেবা এখনো তার বিয়ের কথাটা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে বলতে পারে নি। লজ্জা পাচ্ছে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং সুযোগ খোঁজার জন্য সে খুব বাধ্য মেয়ের মতন সেবা করছে কাকীমার! আমাকে দেখে বললো, জ্যোতিদা, বসুন, আসছি আমি। রেবার হাত তখন ডাল-বাটায় মাখামাখি, কাকীমা বড়ি দিচ্ছেন, রেবা তাঁকে সাহায্য করছে। আজ দুপুরে আমার এখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

খানিকটা বাদে রেবা হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলো। সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে রেবার, মুখখানা সুস্বাস্থ্যের আভায় জ্বলজ্বলে। তাকে অনায়াসেই কুমারী মেয়ে বলে বিশ্বাস করা যায়, সে যে বিধবা—সে কথা কেউ না জানলে কোনো ক্ষতি ছিল না। তবে, তার বাঁ হাতের মধ্যমায় এখনো রয়েছে হিমানীশের দেওয়া আংটি। এ আংটি হিমানীশ আমার সঙ্গে গিয়ে কিনেছিল। এখনো আমার মনে আছে সেই দিনটা। কি উৎসাহ আর অস্থিরতা ছিল হিমানীশের। দারুণ ভালোবাসতো রেবাকে। কিন্তু মৃত মানুষের ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

রেবা এখনো সেই আংটিটা খোলে নি। অবশ্য, আমি ছাড়া আর ক'জনই বা জানে যে ঐ আংটি হিমানীশের দেওয়া!

রেবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলেছো?

আরক্ত মুখে রেবা বললো, না, বলতে পারছি না! জ্যোতিদা, আপনি একটা বুদ্ধি দিন তো, ঠিক কি ভাবে বলা যায়!

—সোজাসুজি বলে ফেলো না। আমি বলছি, ওঁরা সবাই রাজী হবেন, খুশীই হবেন বরং। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

—আমি শুধু সীমাকে বলেছি।

—ধ্যাৎ, ওরকম ভুল করো না। কারুর থ্রু দিয়ে বলাবার দরকার কি? বরং সবাই যখন এক জায়গায় থাকবে—

—না, জ্যোতিদা, আমার কি রকম অপরাধী-অপরাধী লাগছে। সীমা কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে অবশ্য বললো, ভালোই তো, কিন্তু মনে হলো যেন আঘাত পেয়েছে—

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, খবরটা শুনে প্রথমে ওদের একটু মন খারাপ লাগবেই। সেটা ওদের আপত্তির জন্য নয়! এটা শুনলেই ওদের হিমানীশের কথা নতুন করে মনে পড়বে। পড়তে বাধ্য। তখন দুঃখ হবে না? একমাত্র ছেলে, অমন ব্রিলিয়াণ্ট—মনীশকাকা তবু শক্ত

আছেন, কিন্তু কাকীমা—

—আমারও খুব মনে পড়ছে ওর কথা! আচ্ছা জ্যোতিদা, বিয়ে করে যদি আমি সুখী না-হতে পারি? যদি ওর কথাই—

—না, না, তা ঠিক নয়। মৃতদের বেশী মনে রাখতে নেই। তাদের স্মৃতি আঁকড়ে থেকে জীবিতদের বঞ্চিত হওয়াও কোনো মানে হয় না।

—আমার কি রকম ভয় করছে। আগে বুঝতে পারি নি। এখানে এসে কি রকম যেন দিশেহারা হয়ে গেছি।

—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার হয়ে আমিই বলে দেবো। আমিই ম্যানেজ করে দেবো সব কিছু।

রেবার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার হাতে হাত রেখে বললো, বলবেন? সত্যি?

—হ্যাঁ বলবো। হিমানীশ ওঁদের ছেলে ছিল, আমারও তো সে ছিল প্রাণের বন্ধু। আমার দাবিও কি কম? আমি যদি রাজী হতে পারি—

—জ্যোতিদা, আপনি সত্যি আমাকে সাহায্য করবেন?

—আরে, ও জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আজ দুপুরে খেতে বসার সময় সবাই যখন এক সঙ্গে থাকবে। সুপ্রতীপবাবুকে আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ ভালো লোক—। কি করে আলাপ হলো, বলো—

—সুস্মিতাদের বাড়িতে। বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসে আমি সুস্মিতাদের বাড়িতে উঠেছিলাম, মাত্র দু'দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর বহরমপুরে ফিরে গিয়েই ওর যখন একটা চিঠি পেলাম—। জ্যোতিদা. আমি খুব নরম মেয়ে নই, হঠাৎ হঠাৎ প্রেমে পড়া আমার স্বভাব নয়—অনেক পুরুষের সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় আছে। কিন্তু সুপ্রতীপকে দেখার পরই কি রকম যেন একটা হয়ে গেল! সুপ্রতীপও আমাকে দেখে একেবারে পাগলের মতন—

আমি হাসতে হাসতে বললাম, যখন হয়, ঐ রকমই হয়! তবে তোমাদের সৌভাগ্য। তোমাদের দু'জনেরই এক সঙ্গে হয়েছে—

—জ্যোতিদা, আপনি খুশী হয়েছেন দেখে এত ভালো লাগছে! আপনিও যদি ভালো মনে ব্যাপারটা না নিতেন—

আমি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললাম, আমি পুরোপুরি খুশী হয়েছি, কে বললো তোমাকে? আমি বেশ আঘাত পেয়েছি। সুপ্রতীপবাবুকে রীতিমতন ঈর্ষা করছি আমি। আমি আর হিমানীশ যাকে বলে হরিহর-আত্মা

ছিলাম—ও এখন নেই, ভেবেছিলাম তুমি আমাকে একটু পাত্তা-টাত্তা দেবে—

গভীর প্রেমে ডুবে আছে রেবা, এখন তার ঠাট্টা বোঝার মতন মন নেই। ভারী গলায় বললো, ও কথা বলছেন কেন? আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনাদের দুজনকে কতদিন এক সঙ্গে দেখেছি—আপনারা দু'জনে বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আপনাদের দু'জনের চেহারায়, স্বভাবে, কথা বলার ধরনে কোনো মিল ছিল না, ও এত ছটফটে—

রেবাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, চেহারার মিল থাকলে চান্স ছিল? রেবা, তুমি অসিত মজুমদারকে দেখেছো?

রেবা আমার মুখের দিকে থমকে তাকালো। কথাটা বুঝতে একটু সময় নিল। তারপর হাসলো। বললো, জ্যোতিদা, সুস্মিতার ওপর বুঝি আপনার একটু দুর্বলতা হয়েছে? ও কিন্তু বড় কঠিন মেয়ে! এমন জেদী—

আমি বললাম, চুপ! ওর চরিত্র তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি সব জানি।

—সব জানেন মানে? আপনার সঙ্গে আগে ওর পরিচয় ছিল? সুস্মিতা তো সে কথা বললো না?

আমি রেবার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললাম, তুমি অসিতকে দেখেছো?

—না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি একবারও। তবে অনেক কিছু শুনেছি। এক সময় সুস্মিতার সঙ্গে ওর দারুণ—

আমি আবার রেবাকে থামিয়ে দিলাম। আমি যে খেলা খেলতে শুরু করেছি, এত আগে থেকে কিছু জানা চলে না। অসিত কিংবা মায়া (সুস্মিতা) সম্পর্কে আমি রেবার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই না।

—তোমরা এখান থেকে কোথায় বেড়াতে যাবে ঠিক করলে?

—আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন?

—আমাকে নেবে কেন তোমরা? তোমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকলে অস্বস্তিবোধ করবে!

—আজ সকালে এরা ফোন করেছিল। কোথায় যাওয়া হবে এখনো ঠিক নেই, দু একজন বলছে বরাকরের কথা, আবার দু' একজন বলছে চিত্তরঞ্জন, ওখানে একটা সুন্দর বাড়ি আছে। কিছু ঠিক হয়নি! ঠিক হলে আপনি যাবেন?

—তোমাদের সঙ্গে আমার যাওয়া চলে না।

—আমি আজ সকালে টেলিফোনে ওদের বলেছিলাম, বরাকরে আপনি যখন বাড়ি ঠিক করে দিতে পারেন—তখন আমরা এক সঙ্গেই সবাই মিলে

—কিন্তু ওরা মন ঠিক করতে পারছে না! সুস্মিতার বন্ধুর বাড়ি চিত্তরঞ্জনে—অবশ্য ওকে আমি যদি জোর করি, ও ঠিক আমার কথা শুনবে। সুস্মিতা আমার দারুণ বন্ধু—

—না, জোর করে ওকে কিছু বোঝাতে যেও না। চিত্তরঞ্জনও খুব ভালো জায়গা। আমি খুব ছেলেবেলায় মিহিজামে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

—জ্যোতিদা, সত্যি করে বলুন তো, সুস্মিতাকে আপনি আগে থেকে চিনতেন কি না? কাল আপনি যে-রকম হিপ্নটিজমের খেলা খেললেন, আগে থেকে চেনা না থাকলে

—সুস্মিতাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি।

—ও তো তা বললো না! আউটরাম ঘাটে লেমন ইয়োলো শাড়ী পরা ওকে আপনি দেখেছিলেন, সে কথাও তো ও অস্বীকার করলো। সুস্মিতা তো মিথ্যে কথা বলে না!

—আমিও মিথ্যে কথা বলি না! আমাকে কখনো মিথ্যে কথা বলতে শুনেছো?

—কি যেন একটা রহস্য করছেন আপনি! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তুমি এখন নিজের ব্যাপার নিয়ে ডুবে আছো তো, তুমি এখন বুঝতে পারবে না।

॥ ৭ ॥

আসানসোল ছাড়ার সময় আমি কারুকে কিছু জানালাম না। রাত্তিরে হোটেলে ফিরে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। বেরিয়ে পড়লাম ভোর বেলাতেই। রাত্তিরেই ম্যানেজারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়েছিলাম, তখন খেয়াল হয়েছিল, আমার ছোট্ট খেলাটায় একটা ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। হোটেলের বিল দিয়েছে অসিত মজুমদারের নামে, এই বিল আমার অফিসে দেওয়া যাবে না। এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট ভাউচারের জন্য বেশ পেড়াপেড়ি করে।

সামান্য টাকা, তবু কিছুক্ষণের জন্য দমে গিয়েছিলাম। প্রবৃত্তির ছোট-খাটো দুর্বলতাগুলো মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খেলতে নেমে খেলার নিয়ম ভুলে যাই।

ভোরবেলা স্টেশনে এসেছিলাম কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য। মনীশ-কাকার বাড়িতে কারুকে বলিনি যে আমি আজই আসানসোল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রেবার ধারণা আমি আরও দু' একদিন থাকবো। রেবা আমার ওপর খুব খুশী। মনীশকাকা কিংবা কাকীমা একটাও আপত্তির কথা উচ্চারণ করেন নি, এমনকি মুখের বিষণ্ণতা যথা সম্ভব লুকিয়ে বেশ খানিকটা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। জানি, কাকীমা সারারাত ধরে কাঁদবেন, মনীশকাকা রুগী দেখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন—তবু রেবাকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করবেন না। নিজের পুত্রবধূ আবার বিয়ে করতে চাইছে—তাতে সম্মতি দিতে হবে, এমন কঠিন মুহূর্ত মানুষের জীবনে খুব বেশী আসে না।

রেবার বন্ধুরা খুব খুশী হয়ে হৈ চৈ করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি টের পেয়েছি, মায়ার (সুস্মিতার) সঙ্গে আসানসোলে আমার আর দেখা হবে না। কি করে টের পেলাম? যে-ভাবে টের পেয়েছিলাম, ট্রেনের জানলায় ওকে দু' এক পলক দেখার পর—ওর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই।

টিকিট কাটতে গিয়ে মন বদলে ফেললাম। না, এখন কলকাতায় ফেরার কোনো মানে হয় না। কোথায় যাবো তা হলে? চিত্তরঞ্জনে না বরাকর? চিত্তরঞ্জনেরই সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু আমাকে বরাকরেই যেতে হবে। ঠিক ঠিক খেলতে গেলে এরকমই খেলতে হয়। আমি বরাকরের কথা বলেছিলাম, ওরা চিত্তরঞ্জনে যেতে চাইছে। যাক্ না। সম্মোহন শক্তি না থাকলে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

বরাকরের এই ডাক বাংলোটাতে আমি আগেও দু' তিনবার থেকেছি। আমার বেশ লাগে। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে বাংলোটার দিকে। বাংলোটার ঠিক নীচেই নদী।

এবার দেখলাম বাংলোয় ঢোকার মুখে একটা নোটিশ টাঙানো রয়েছে। নোটিশটা বেশ মজার। বাংলোটার তলার দিকে ধ্বসে যাচ্ছে, রিপেয়ারের কাজ শিগগিরই শুরু হবে, তার আগে যাঁরা বাংলোটায় থাকতে চান, তাঁরা নিজের দায়িত্বে থাকবেন। চমৎকার, আমার পক্ষে খুব উপযোগী! যে বাড়ি হঠাৎ নদীর মধ্যে ধ্বসে পড়তে পারে, আবার না-ও পারে,

সেইটেই তো আমার ঠিক যোগ্য জায়গা।

ভাগ্যিস ঐরকম নোটিশ ছিল, তাই বাংলোটা একেবারে ফাঁকা পাওয়া গেল! কোনো ঘরেই লোক নেই। চৌকিদার আছে অবশ্য। পুরো দু'টো দিন ঐ বাংলোতে আমি কাটিয়ে দিলাম।

অনেকদিন এমন ভালো সময় কাটে নি। সর্বক্ষণ এমন একা বহুদিন থাকিনি। সারাদিন কিছুই করার নেই। বই আনিনি, ট্রানজিস্টার রেডিও আনিনি, শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ মনে পড়ে না। আমি তেমন ভ্রমণবিলাসী নই, জায়গাটা অবশ্য বেড়াবার পক্ষে তেমন ভালোও নয়। নদীর ওপরে সরু ব্রিজ, ওপারে কুমারডুবি—বিহার পড়ে যাচ্ছে। এখানে স্মাগলারদের খুব উৎপাত, সন্ধ্যের দিকে একা ঘোরাফেরা খুব নিরাপদ নয়।

এখন আমি একা, এখন আমি অসিত মজুমদারও হতে পারবো না, জ্যোতি রায়চৌধুরীও নই। একা মানুষের কোনো চরিত্র থাকে না। অন্য মানুষের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র ফুটে ওঠে, প্রতিটি অন্য মানুষই দর্পণের মতন।

অবশ্য, অসিত মজুমদার যদি খুব উদ্যোগী পুরুষ হয়, তাহলে হয়তো সে এরকম চুপচাপ বসে থাকতো না। সমস্ত এলাকাটা ঘুরে দেখতো কোথায় কি দর্শনীয় স্থান আছে, লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতো, জিনিসপত্রের দর-দাম যাচাই করে নিত। সাধারণত উদ্যোগী লোকেরা এরকম করে। তবে, আমিও তো এরকম আর কখনো পুরো দু'দিন কোনো ডাক বাংলোতে একা চুপচাপ কাটাই নি।

অসিত মজুমদার কি রকম মানুষ আমি জানি না। আমার জানার দরকারও নেই। তাকে আমি আমার একটি পরিপূরক সত্তা বলে ধরে নিয়েছি। আমার চরিত্রে যা যা অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, ও যেন তারই সার্থকতার প্রতিমূর্তি।

আমার ব্যর্থতা অনেক। সেগুলো অবশ্য সাধারণত অন্যদের চোখে পড়ে না। সাধারণের চোখে তো আমি বেশ ঈর্ষনীয়—চেহারা খুব খারাপ নয়, দু' একটি মেয়ে সুন্দরই বলেছে, পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালো ছিলাম, চাকরি অন্য অনেকের তুলনায় বেশ ভালো করছি। কিন্তু—। যাক্‌গে, একা থাকলেই এই ধরণের চিন্তা মাথায় আসে, মর্বিডিটির লক্ষণ। এত আত্ম-সমালোচনার কি দরকার?

ডাক বাংলোর পাশের জমিটায় বসে বিকেলবেলা নদীর দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে। বেশ জমকালো লাল রঙের আকাশে সূর্য অস্ত যায়। এখন গ্রীষ্মকালে নদীটি শীর্ণা, মাঝখান দিয়ে খানিকটা জলের তোড় দেখা গেলেও প্রচুর বালিয়াড়ি—তবু শেষ সূর্যের রশ্মিতে সব কিছুই খানিকটা অলৌকিক সুন্দর হয়ে ওঠে।

নদীর দৃশ্য অবশ্য সুস্থিরভাবে দেখার উপায় নেই। প্রথম দিন খেয়াল করিনি, দ্বিতীয় দিন চোখে পড়লো, ঠিক বিকেলের দিকেই অনেক আদিবাসী নারী-পুরুষ নদীতে স্নান করতে আসে। বিকেলে স্নান করার স্বভাব কেন ওদের? কারণটা বুঝতে অবশ্য দেরী হয় না। সারাদিন ওরা কোথাও কুলি-কামিনের কাজ করে, কাজ সেরে আসে স্নান করতে। স্বভাবতই ওরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্নান করার সময় ওরা আব্রু রাখে না। এভাবে নদীর পারে বসে থাকা চলে না আমার, বুঝতে পারি। কেউ দেখলেই ভাববে, আমি নদী দেখছি না, স্নান লীলা দেখছি। কারুকে তো বোঝাতে পারবো না যে দূর থেকে এরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা আমার স্বভাবে নেই!

নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়েও বসা যায় না। সেটা নদীকে অপমান করা হয়। ঠাকুর-দেবতার সামনে যেমন পা মুড়ে বসতো লোকে, এও সেই রকম। চোখের সামনে একটা নদী দেখেও যারা অগ্রাহ্য করে, তারা বড় মূঢ়।

উঠে ব্রীজ পেরিয়ে কুমারডুবিতে চলে যাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহারে চলে গেলুম কেমন অনায়াসে। কেউ বাধা দিল না। কবে এমন হবে, ভারত থেকে চীনে যেতে পারবো এই রকম অবলীলাক্রমে? পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই যাওয়ার জন্য ইচ্ছে ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না!

রেবা আর ওর বন্ধুরা কি এতক্ষণে চিত্তরঞ্জনে চলে গেছে, না আসানসোলেই আছে। আর আসানসোলে থাকার দরকার কি, রেবার কাজ তো হয়েই গেছে! মনীশকাকা বলেছেন, আগামী মাসে তিনি উৎসব করবেন, জ্ঞাতি গুষ্ঠি আত্মীয় স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করবেন রীতিমত কার্ড ছাপিয়ে। কাকীমা আবার পঞ্জিকা দেখে একটা বিয়ের তারিখ পর্যন্ত বার করেছেন। ওঁরা দুজনে অবশ্য জানেন না যে রেবা ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রি করে ফেলেছে! এটা জানতে পারলে ওঁরা সত্যিই আঘাত

পেতেন। রেবা যে ওঁদের অনুমতি পাবার আগেই বিয়ে করে ফেলেছে, অর্থাৎ ওঁরা অনুমতি না দিলেও আটকাতো না—এটা বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই খুব অপমানিত বোধ করতেন।

আসানসোলে থাকার প্রয়োজন নেই, ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিত্তরঞ্জনে চলে গেছে। মায়ার ইচ্ছে চিত্তরঞ্জনে যাওয়ার। আগে ঠিক ছিল বরাকরে আসবে। দেখা যাক্। আমি যদি সম্মোহন শক্তিতে ওদের এখানে টেনে আনতে না পারি, তা হলে এখানেই খেলা শেষ। এরকম পাগলামী আমি আর করবো না। কলকাতায় কত জরুরী কাজ বাকি আছে। এখানে পড়ে আছি কি এমনি-এমনি ? যে খেলায় আমি নেমেছি, সে খেলায় হয় সম্পূর্ণ জিৎ, অথবা সম্পূর্ণ হার, মাঝামাঝি কিছু নেই।

দু'দিন বরাকরে থাকার পর মনে হলো আমি হেরে গেছি। ভুল জায়গাতেই বাজি ফেলেছি আমি। তবু একা থাকার নেশাতেই আরও একদিন থেকে গেলাম। সেদিন সন্ধেবেলা আর নদীর পারে বসলুম না। ব্রিজ পেরিয়ে কুমারডুবিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম এলোমেলো ভাবে। ফেরার পথে আবার ব্রিজ দিয়ে আসছি, সাইকেল রিক্সা আর লরির জড়াজড়ি, কয়েকজন ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোককে জায়গা দেবার জন্য আমি ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল।

—মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?

—না তো, কে আপনি ?

—ভালো করে চেয়ে দ্যাখো।

—চেহারাটা চেনা-চেনা, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না !

—শুধু চেহারা দেখো না, আমার ভেতরে দ্যাখো। সব মানুষেরই যদি দেবতার অংশে জন্ম হয়—তবে যে এক টুকরো মানুষকে তুমি দেখেছো, তারই আর এক টুকরো তুমি দেখতে পাচ্ছো না ?

—না, চিনতে পারছি না !

—ভালো করে দ্যাখো।

—আর কত ভালো করে দেখা যায় ? এই তো দেখছি !

—না, এখনো দৃষ্টি স্থির করো নি। আমার চোখের দিকে তাকাও, আর কিছু ভাববে না এখন !

—কেন, ওরকম করবো কেন ? আপনি কে ?

হ্যাঁ, এগুলোও মনে মনে কথা বলা। তবে প্রলাপ নয়। মায়া, রেবার

স্বামী, তার বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী—এই চারজনই হেঁটে যাচ্ছে ব্রি
দিয়ে। রেবা নেই, সে আসেনি। ওরা মগ্ন হয়ে গল্প করছিল, আমাকে
দেখতে পায়নি।

কি সাহস আমার, ওদের দেখেও ডাকলুম না আমি। ওদের দেখে
হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠা উচিত ছিল আমার, জয়ের আনন্দে গদগদ হয়ে
পড়াও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পায়নি,
আমিও ডাকলুম না। ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলুম। যদি এখানেই টেনে
আনতে পারি, তা হলে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে! আমি চাই মায়া
আমাকে দেখে এবার প্রথম কথা বলবে।

বাংলোয় ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম।
তারপর নদীর দিকে চাতালে এসে বসে রইলাম। এখন অন্ধকার হয়ে
এসেছে, এখন আর স্নানের দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা নেই। ওরা কি এখানে
আসবে না? এখানে যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়ায়, তারা একবার-না-
একবার বাংলোর দিকটায় সাধারণত আসে। নদীর ধারে বেড়াতে হলে
এদিকে আসতেই হবে। যদি না হঠাৎ বাংলোটা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনার
নোটিশ দেখে ওরা ভয় পায়।

ইস্, ওদের সখ তো কম নয়! একেবারে নদীর গর্ভে নেবেছিল। নদীর
জলে পা ধুতে অনেকেরই ইচ্ছে হয়। অনেকে নদীর জলে কুলকুচো করে
নদীতে থুতু ফেলে। এই অভ্যেসটা ভালো নয়, মায়া নিশ্চয়ই এটা চায়
নি, এটা ওর বন্ধুদেরই ইচ্ছে।

একটা পায়ে চলা রাস্তা আছে নদী থেকে উঠে আসার, দিনের বেলা আমি
দেখেছি। সন্ধের অন্ধকারে ওরা সেটা খুঁজে পায় নি, কিংবা খোঁজেনি,
ওরা ঢালু পাড় পেয়ে অ্যাডভেঞ্চার করে উঠে আসছে।

রেবার নতুন স্বামী ধরেছে মায়ার (সুস্মিতার) হাত, একেবারে ওপরে
উঠে এসে ওরা হাত ছাড়াছাড়ি করলো। পুরুষটি বললো, উপস্, আর
একটু হলেই পা পিছলে পড়ে যেতুম! এই সুস্মিতা, তোমার শাড়ী যে
একদম ভিজে গেছে!

—ভিজুক! কি ঠাণ্ডা জল, এত ভালো লাগছিল! কাল এই নদীতে
চান করতে আসবো!

—দিনের বেলা ভালো লাগবে না। হয়তো দেখবে নোংরা।

—নদীর জল কক্ষনো তেমন নোংরা হয় না। বেশ স্রোত আছে কিন্ত!

আমাকে ওরা দেখতে পায় নি। আমি অনুচ্চ স্বরে বললুম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?
আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো কিনা জানি না, তবে আমার গলার আওয়াজ শুনে ওরা ফিরে তাকালো। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, ওরা হঠাৎ চুপ করে গেল, একটু সন্দিগ্ধ। আর দুজনও এর মধ্যে ওপরে উঠে এসেছে। এদিকে কয়েক পা এগিয়ে সুস্মিতা বললো, আরেঃ, ইনি তো সেই রেবাদের বাড়িতে—
আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, চিনতে পারছেন ?
ওরা কেউই এখন আমার সঙ্গে আড়ষ্ট ব্যবহার করতে ঠিক চায় না, কারণ আমি রেবার উপকার করেছি। কিন্তু ওরা আর বন্ধু বাড়াতেও ইচ্ছুক নয়। রেবার স্বামী বললো, আপনি এখানে ? কবে এসেছেন ?
—দু' তিনদিন আগে। আমার তো এখানে আসারই কথা ছিল।
—ঐ বাংলোতে উঠেছেন বুঝি ?
—হ্যাঁ, আসুন না, একটু চা খেয়ে যাবেন !
একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে জিজ্ঞেস করলো, কি, একটু চা হবে নাকি ? জ্যোতিবাবু বলছেন—
সেই পুরুষটি নিমরাজি গলায় বললো, তা মন্দ না। অবশ্য চা খেয়েছি একটু আগেই—
আমি বললুম, আরে, আসুন, আসুন। চা একটু আগে খেলেও অনায়াসেই আর একবার খাওয়া যায় !
চারজনকে নিয়ে আমি এগুতে লাগলাম বাংলোর দিকে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সুস্মিতার পাশাপাশি হাঁটতে, শুধু ওরই সঙ্গে কথা বলতে। চুম্বকের মতন সুস্মিতা আমাকে টানছিল। কিন্তু ওরকম অভদ্রতা করা আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এই জায়গাটার প্রকৃতি ও দৃশ্য সম্পর্কে দু'একটা টুকিটাকি কথা বলা হলো। তারপর আমি হাসতে হাসতে একজন পুরুষকে বললাম, এবার আমাকে দেখে আপনাদের বন্ধু অসিত মজুমদার বলে চমকে উঠলেন না তো ! এবার আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন কি করে ?

এই কথাটা বলা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে খুব ভুল হয়েছিল। পুরুষ দুজনের কেউ কোনো উত্তর দেবার আগেই সুস্মিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বাংলোর বাগানে। বললো, থাক্, এখন আর চা খেয়ে দরকার

নেই ! চলো, এখন বাড়ি ফেরা যাক্ !

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বললুম, আসুন না, কতক্ষণ আর লাগবে !

সুস্মিতা বললো, না, আমার শাড়ীটা অনেকখানি ভিজে গেছে, বাড়ি গিয়ে এটা বদলাতে হবে। ভিজে শাড়ী পরে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

এরপর আর কিছু বলা যায় না। ওর ভিজে শাড়ী বদলাবার কোনো ব্যবস্থা তো আমি করতে পারবো না। এর পর বেশী অনুরোধ করা খারাপ দেখায়। বললাম, তা হলে থাক্। চলুন, আপনাদের আমি বাংলোর গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

পুরুষ দু'জন বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হলো। কিন্তু শোধরাবার জন্য কোনো কথা খুঁজে পেল না। অন্য মহিলাটি বললো, বাংলোটা কিন্তু আমার বেশ লাগছে। কাল সকালে এখানে চা খেতে এলে হয়! কাল আপনি থাকছেন তো ?

আমি অনুতপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, না কাল ভোরেই আমি চলে যাচ্ছি। আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না—

কাল ভোরে চলে যাবার কথা আমি আগের মুহূর্তেও ভাবিনি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরী হলো না। মায়া আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকার কোনো মানে হয় না।

চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রাখতে পারেনি বলে ঈষৎ লজ্জিত হয়েছে ওরা। তাই বাকী পথটা ওরা একটু বেশী হাসি মুখে গল্প করতে চাইলো আমার সঙ্গে। আমিও হাসিতে কার্পণ্য করলুম না। একমাত্র সুস্মিতাই চুপচাপ। অসিত মজুমদারের প্রসঙ্গ তোলা আমার ভুল হয়েছে, তবু সেই প্রসঙ্গই আমি বারবার তুলতে লাগলাম অন্যদের কাছে। কত জায়গায় কত লোক যে আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে, বললাম সে কথা।

একেবারে গেটের মুখটায় এসে আমি সুস্মিতাকে হাসতে হাসতে বললাম, আমার কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে আপনিই একদিন লেমন ইয়োলো শাড়ী পরে আমাকে এসে বলেছিলেন, কতক্ষণ ধরে খুঁজছি, তুমি কোথায় ছিলে ?

শুকনো ভদ্রতার হাসি হেসে মায়া বললো, না, আপনার ভুল হয়েছে। আপনি অন্য কারুকে দেখেছেন। আমি অন্তত দু'বছরের মধ্যে গঙ্গার

ধারে বেড়াতে যাইনি। কারুকে খুঁজিনি। ঐ রঙের শাড়ীও আমার নেই। কি এমন হাসির কথা, তবু সবাই হেসে উঠলো। আমিও। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওরা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

বাংলোয় ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে শুরু করলাম। কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। এই ক'টা দিন আমি আমার ইচ্ছের নির্দেশেই চলছিলাম শুধু। আগে থেকে কিছু ঠিক করা নেই, যখন যা মনে হচ্ছে, সেই রকম। কিন্তু মায়ার কথাই শুধু মনে হচ্ছে কেন? আমি আমার জীবনটা বদলাতে চাই, অনেক অপূর্ণতা, ব্যর্থতা আছে, অনেক জায়গায় হেরে গেছি—সেসব কাটিয়ে মানুষ হিসেবে একটু উঁচু হয়ে উঠতে চাই। তার জন্য একটি মেয়ের কৃপা পেতে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি কেন? জানিনা, তবে বারবার মনে হচ্ছে, আমার সেই নতুন জীবন শুরু করার আগে একজন কারুর কাছে স্বীকৃতি পাওয়া দরকার। সেই একজন কেউ কি একটি মেয়েই হতে হবে? মেয়ে হলেও শুধু মায়া কেন, আরও তো অনেক মেয়েকে আমি চিনি। তবু মায়ার কথাই মনে হচ্ছিল বারবার।

এবার কিছুদিন মায়াকে বাদ দেওয়া যাক। দেখা যাক, অফিসে, বাড়িতে, রাস্তায় মানুষ হিসেবে আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি কি না। সেই পরিপূর্ণতা কি রকম তা আমি জানি না—খুঁজে নিতে হবে, নিতেই হবে, এই এক ঘেঁয়ে জীবনের কোনো মানে হয় না।

॥ ৮ ॥

—আপনি কেন ছায়ার মতন আমার সঙ্গে ঘুরছেন?

—আমি জানি না।

—জানেন না? এর মানে কি?

—আমি কি আপনার কোন অসম্মান করেছি? আপনার দুঃখ পাবার মতন কিছু করেছি?

—অসম্মান করেন নি হয়তো কিন্তু একজন মানুষ বিনা কারণে সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে, এতে একটা দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা হয় না? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আমি আর পারছি না। আপনি কি চান?

—বিশ্বাস করুন, আমি কি চাই তা ঠিক জানি না।

—তাহলে এরকম পাগলামি করছেন কেন ?
—সত্যিই কি এটা পাগলামি ! হতেও পারে। আচ্ছা, আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। বোঝাবার সুবিধের জন্য, আপনাকে কি আমি এখন থেকে তুমি বলতে পারি ?
—কেন ?
—ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কেন জিজ্ঞেস করবেন না। এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি রাস্তার সাধারণ গুন্ডা-বদমাইশদের মতন নই, আপনার কোন ভয় নেই।
—অনেক ভদ্রবেশী ভয়ংকর লোককেও আমি দেখেছি।
—আমি সেরকম নই।
—কি করে বুঝবো ?
—বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে।
—কিন্তু আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি যদি জোর করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, সেটা কি অন্যায় নয় ? আপনি আমার কলেজে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন ?
—আপনি কেন বলেছিলেন, আপনি কলেজে পড়ান না ?
—এমনিই ইচ্ছে হয়েছিল, বলেছিলাম। ইচ্ছে মতন দু'একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকারও নেই নাকি আমার ?
—না।
—তার মানে ?
—মিথ্যে কথা বলা তোমাকে মানায় না।
—আমি কিন্তু এখনও আপনাকে তুমি বলার অধিকার দিই নি।
—এক্ষুনি দাও সে অধিকার ! আমি তোমাকে প্রথম থেকেই মনে মনে তুমি বলছি। সেটাই সুবিধেজনক।
—আচ্ছা, কি বলবেন, বলুন !
—আর একটা কথা। আমি তোমাকে মায়া নামে ডাকবো ?
—মায়া ? হঠাৎ মায়া কেন ?
—আমি মনে মনে তোমাকে ঐ নামে ডাকি।
—আপনি আমাকে মনে মনে কিছু একটা নামে ডাকবেনই-বা কেন ?
—মনের ওপর তো আইন প্রয়োগ করা যায় না !
—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার সেরকম কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়নি

যে আপনি—

—এটা ঘনিষ্ঠতার প্রশ্ন নয়।

অনেক চেষ্টা করেও সুস্মিতা হাসি চাপতে পারলো না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অবিশ্বাসী মুখ, কিন্তু ঠোটে পাতলা হাসি। বললো, মায়া নামে কোনো মেয়েকে আপনি চিনতেন বুঝি? আমাকে তার জায়গায় বসাতে চাইছেন?

মেয়েরা গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। সুস্মিতা আমার ওপরে রাগ করেও একটা গল্প শোনার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ও আমার কাছ থেকে একটা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শুনতে চায়। মায়া আর জ্যোতি, এদের কেমন করে ভালবাসা হলো, কেমন করে বিচ্ছেদ এলো— ।

আমি মৃদু গলায় বললাম, না, আমি মায়া নামের কোনো মেয়েকে চিনি না। সে রকম কোনো ব্যাপার নয়।

—তাহলে হঠাৎ এই নামটা—

—সেটা বোঝাতে অনেকটা সময় লাগবে।

—যাকগে, দরকার নেই। মনে মনে আপনি যা খুশী বলতে পারেন কিংবা ভাবতে পারেন, আমি তো আর তা আটকাতে পারি না। আপনি কি বলবেন বলেছিলেন, তাই বলুন! কেন আপনি এরকম—

—তার আগে তুমি একটা কথার জবাব দাও। বেগমপুর স্টেশনে তুমি আমাকে দেখার জন্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে চোখ দিয়ে খুঁজছিলে। এখন আমাকে চোখের সামনে দেখেও তুমি অপছন্দ করছো কেন?

—ওঃ, সেই রেলে যাবার সময়? সে তো আপনাকে খুঁজিনি, সে তো—

—তাহলে কি চা-ওয়ালাকে খুঁজছিলে? আমার পেছনে কোন চা ওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল?

সুস্মিতা অল্প একটু হাসলো। মেয়েটির এই গুণটি আছে, ঠিক সময় হাসতে জানে। হাসতে হাসতে বললো, না, চা ওয়ালাকে খুঁজিনি ঠিকই। সুজয়দা বলছিলেন, অবিকল তাঁর বন্ধুর মতন চেহারার একজন লোক ওখানে দাঁড়িয়ে সত্যিই তা সম্ভব কিনা, সেটা দেখার জন্যই—

- সত্যিই কি এক রকম?

—হুবহু এক রকম কি আর দু'জন মানুষ হয়? অনেকটা এক—

—সেইজন্যই কি তোমার আপত্তি? হুবহু এক হলে এত বিরক্ত হতে না?

—এসব কি আজে-বাজে কথা বলছেন? কারুর সঙ্গে কারুর চেহারার একটু আধটু মিল থাকলেই বা কি আসে যায়? আপনি কি বলবেন, বলুন! আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না।
—অসিত মজুমদারের সঙ্গে বুঝি তোমার অনেকদিন দেখা হয় না।
—আপনি শুধু আজে-বাজে কথা বলে সময় কাটাচ্ছেন।
—ঠিক তাই। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগছে। যতক্ষণ থাকা যায়—
—কিন্তু আমার আর সময় নেই। আমাকে এবার যেতে হবে। আপনি কথা দিন, আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না।
—কেন?
—দেখুন, রেবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি রেবার আত্মীয়, সুতরাং আপনাকে অপমান করতে চাই না আমি। কিন্তু এসব আমি একদম পছন্দ করি না--আমার পেছনে পেছনে সব সময় একজন লোক ঘুরবে, দেখা হলে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে, এসব আমার কাছে অসহ্য।
—এই যে তুমি বললে আমাকে অপমান করবে না, কিন্তু করছো তো!
করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি দয়া করে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি কি রকম মেয়ে সেটা রেবার কাছ থেকে জেনে নেবেন বরং—
—তোমার সম্পর্কে আমি সবই জানি, রেবার কাছ থেকে কিছু জানার দরকার নেই।
—কি জানেন আমার সম্পর্কে?
—কি জানি না?
—ঠিক আছে, এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি কথা দিন, আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা করবেন না।
—সে রকম কথা আমি দিতে পারবো না।
—পারবেন না?
—শোনো, শোনো, এ জন্য তোমার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে লোকজন ডাকার দরকার নেই। পুলিশেও খবর দিতে হবে না। আমি বিপজ্জনক নই।
সুস্মিতা এবার অসহায় মুখ করে বললো, কি মুস্কিল। আমার যদি ইচ্ছে না করে, আমার যদি পচ্ছন্দ না হয়, তাও আপনি আমাকে—
—আসানসোলে সেই হিপ্নোটিজম্ খেলার সময় তোমাকে অজ্ঞান হবার ভাণ করতে অনুরোধ করেছিলাম—তুমি সেই অনুরোধ রেখেছিলে কেন?

—বাঃ, সেটা তো ভদ্রতা করে—তাছাড়া, ওটা খেলা হিসেবে বুঝতে পেরেছিলাম বলেই মজাটা নষ্ট না করার জন্য—

—মায়া, এটাও তো খেলা। এই খেলায় তুমি আমার—

মায়া অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, না, আমি আর কোনো খেলা খেলতে চাই না আপনার সঙ্গে।

আমি মায়ার চোখের দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। চোখের দিকে চেয়ে থাকলে শুধু চোখই দেখা যায়, আর কিছু না।

আমি লজ্জিতভাবে হেসে বললাম, তাহলে খেলা শেষ। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন আপনাকে বিরক্ত করবো না। চলুন সুস্মিতাদেবী, আপনাকে বাসে তুলে দিচ্ছি!

সুস্মিতা রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে, কল্পনাও করে নি। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি ভূতগ্রস্তের মতন দিনের পর দিন আমার কল্পনার মায়াকে অনুসরণ করছিলাম। আসানসোলে পরের দিন সকালেই আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। সন্ধেবেলা ম্যাজিক শো শেষ হবার পর গেটের মুখে আবার দেখা করেছি! ওরা বরাকরে গিয়েছিল, আমিও গেছি সেখানে। ওরা কিছুতেই আমাকে গ্রহণ করেনি ওদের দলে, কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারেনি আমার সঙ্গে। রেবা অবাক হয়েছে, শেষের দিকে একটু বিরক্তও হয়েছে, আমি গ্রাহ্য করিনি। কলকাতায় এসে সুস্মিতার বাড়ি খুঁজে নিতে আমার খুব বেশী অসুবিধা হয়নি, ও যে-কলেজে পড়ায়, গেছি সেখানে। বেয়ারার হাতে শ্লিপ পাঠিয়ে আমি ডেকে পাঠিয়েছি ওকে। অত্যন্ত বিরক্ত হলেও কলেজে স্ক্যাণ্ডাল হবার ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা না করে পারে নি।

সুস্মিতা (তখন মায়া ছিল) জিজ্ঞেস করেছিল, কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? আপনি আমাকে ভালো করে চেনেন না, আমি আপনাকে ভালো করে চিনি না—। আমি বলেছিলাম, আমি আপনাকে খুব ভালই চিনি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

কেন করেছিলাম এরকম? কোনো যুক্তি নেই। চিরকাল লাজুক ও ভদ্র হিসেবে পরিচিত, লেখাপড়া শিখেছি, মোটামুটি ভালো চাকরি করি। মেয়ে-পাগলা বলে আমার কোনোদিন বদনাম হয়নি। সামাজিক পরিচিতির ফলে এমনিই দু' পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তারা কেউ

মায়ার চেয়ে কুরূপা নয়, তা হলে? আসানসোলে ট্রেন থেকে হঠাৎ আমার অন্য মানুষ হতে ইচ্ছে হয়েছিল, নিজের পরিচিত সত্তা থেকে মুক্তি নিয়ে অন্য একটা পরিচয়।

কিন্তু অন্য মানুষ হওয়া মানে কি একটা মেয়ের পেছনে ছুটে বেড়ানো? আমি কি চাকরির খোলস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে মানুষের সেবায় নিযুক্ত হতে পারতাম না? এতদিন কত অন্যায় চোখে দেখেও সহ্য করেছি, একবার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতাম না? হয়তো পারতাম, কিন্তু তার আগে শুধু বারবার মনে হচ্ছিল, অন্য মানুষ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি পাওয়া দরকার মায়ার কাছ থেকে।

বরাকর থেকে প্রথম কয়েকদিন আমি মায়ার কথা ভুলে অন্য ভাবে নিজেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই মন লাগাতে পারিনি। চুম্বকের মতন মায়া আমাকে টানছিল।

কিন্তু আসলে এটা একটা খেলারই মতন। মায়া যেই বললো, সে কোন রকম খেলা খেলতে চায় না, অমনি আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। এর পর আর ওকে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না।

রেলিং ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, চলুন, আপনাকে বাসে তুলে দিচ্ছি।

সুস্মিতা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললো, না, না, ঠিক আছে, আপনাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠে পড়বো।

আমি তক্ষুণি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনি যান তাহলে। আমি আর যাবো না।

—আপনি কোনদিকে যাবেন? আপনি যদি ওদিকেই যান, তা হলে অবশ্য এক বাসে উঠতে পারি।

—না, আমি ও দিকে যাবো না। আমি অন্য বাসে উঠবো।

সুস্মিতাও দাঁড়িয়ে পড়লো, খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে বললো, আপনি খুব রাগ করলেন? কারুকে দুঃখ দিতে আমার ইচ্ছে করে না, কিন্তু—

—না, না, রাগ করবো কেন? রাগ করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

—তা হলে হঠাৎ তুমি থেকে আবার এর মধ্যেই আপনি হয়ে গেলাম কি করে?

এবার আমার হাসির পালা। হাসিটা রীতিমতন উপভোগ করে বললাম, খেলা শেষ হয়ে গেছে তো, তাই আর কোনো মেয়েকে প্রথম দেখার পর

থেকেই মনে মনে তাকে তুমি বলবো না, আর তাকে মায়া বলে ডাকবো না। আবার সব আগের মতন।

—দেখুন, আমি বোধহয় খেলাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এ খেলার নিয়ম কি?

—আমি নিজেই জানি না। কোনো নিয়ম নেই, এ খেলা অন্য কারুকে শেখানোও যায় না।

সুস্মিতা বেশ নরম হয়ে পড়েছে। হয়তো, আমার ব্যাপারে ও বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। ভেবেছিল, আমার কাছ থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। হঠাৎ আমি অতিরিক্ত ভদ্র হওয়ায় ও যেন ঠিক বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। কিংবা আমার মনে খুব একটা আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা ধারণায় ও খুব বিচলিত।

কিংবা, আমার মন থেকে ওর নাম একেবারে মুছে যাবে, এটাও বোধহয় ও খুব পছন্দ করছে না। মনে মনে হয়তো আশা করেছিল, আমি নাছোড়বান্দার মতন এর পরও ওর সঙ্গে লেগে থাকবো আর ও আমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করে আনন্দ পাবে। ঔদাসীন্য মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

হয়তো সেই জন্যই আবার বললো, দেখুন, এমনি কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, মাঝে মাঝে দেখা হয়, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়—

আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার সঙ্গে আর কোনোদিন আমার দেখা হবে না।

—কিন্তু একটা কথা না শুনলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। আপনি কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন—আর কেনই বা হঠাৎ এখন—

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে পড়ে লাগি নি। ব্যাপারটা এই রকম, বেগমপুর স্টেশনে আপনি আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। আপনার সেই ব্যাকুল চোখটা আমার মনে গেঁথে যায়। তারপর থেকে, আমি কখনো কোন কিছু কাজের কথা ভাবলেই মনে হতো, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার সঙ্গে দেখা করা। আর আপনার সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন করা, 'মায়া, তুমি আমাকে চিনতে পারছো?'

—আপনি যেমন আমার নাম মায়া রেখেছিলেন, তেমনি আপনার নিজেরও অন্য কোনো নাম রাখেন নি?

—হ্যাঁ—আমার নাম ছিল অসিত মজুমদার।

সুস্মিতা মুখ নিচু করে দৃঢ় স্বরে বললে, অসিত মজুমদারকে আমি ঘৃণা করি।

—আমি জানতাম।

—আপনি জানতেন? আপনাকে দেখে ওর কথা মনে পড়ে যেত বলেই আমি আপনাকে কখনো ঠিক সহ্য করতে পারি নি।

—সেই জন্যই তো আমার জিজ্ঞেস করারই চ্ছে হতো, 'মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?' আমার এই চেহারার আড়ালে আর একটি মানুষ আছে, সেই মানুষটিও আমার আগেকার আমি নই।

—আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—হ্যামলেটের সেই লাইনটা মনে আছে? থ্রো অ্যাওয়ে দা ওয়ার্সার পার্ট অব ইট, অ্যান্ড লীভ পিওরার উইথ দা আদার হাফ্! আমি চেয়েছিলাম, আমার জীবনের ওয়ার্সার পার্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য অংশটা দিয়ে পবিত্রতর জীবন যাপন করবো। এটা কোনো মহৎ প্রতিজ্ঞা নয়, একটা খেলা বলাই যায়। অসিত মজুমদারের সঙ্গে আমার চেহারার মিল থাকার জন্যই খেলাটার কথা মনে এসেছিল। আমার চেহারা দেখে আপনার একজন চেনা মানুষের কথা মনে পড়বে - কিন্তু ভেতরের মানুষটা অচেনা। সেই অচেনা লোকটার পরিচয় আপনাকে বার করতে হবে—যার পরিচয় আমি নিজেও জানি না। তার পরিচয় গড়ে তোলার জন্য, মনের মধ্যে যখন যা ইচ্ছে হতো—তার একটাকেও বাধা দিতে চাইনি। সবচেয়ে বেশী ইচ্ছে হতো, আপনার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করা, 'মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?'

— এরপর আর এরকম ইচ্ছে হবে না?

—না। কারণ খেলা শেষ হয়ে গেছে! আমি তো সত্যি সত্যি পাগল নই। যান, আপনার বাস এসে গেছে, উঠে পড়ুন।

—খেলা শেষ হয়ে গেছে বলেই আপনি আমাকে বিদায় করার জন্য যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন!

—না, আপনিই বলেছিলেন, আপনার আর সময় নেই।

—আর একটা কথার উত্তর দিন, তারপর আমি চলে যাবো। আমার সঙ্গে দেখা হবার পর আপনি প্রত্যেকবারই কি যেন একটা বলবো বলবো ভাব করতেন; কিন্তু বলেন নি। সেটা কি?

—ঐ যে, ঐ কথাটা, 'মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?'
—শুধু ঐ কথা ? এর আগে ঐ কথাটা আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু' তিনবার বলেছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু আর কিছু বলতে চান নি ?
আমি হো-হো করে হেসে বললাম, আর যাই হোক, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' একথাটা একবারও আমার মাথায় আসে নি।
সুস্মিতা লজ্জা পেয়েও সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললো, আর যাই হোক, আপনাকে এতটা বোকা-বোকা অবশ্য কখনো মনে হয় নি। আমি শুধু আপনার ব্যবহারের কোনো মানে খুঁজে পাই নি।
আমি একটু চিন্তা করে বললাম, গত তিন চারদিন ধরে আর একটা কথাও আমার মনে আসছিল। সেটা বলবো ?
—বলুন !
—আপনার চেহারা ও হাব-ভাবের মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য আছে, যেটা মনের মধ্যে খুব ছাপ রাখে। আগে আমি ভেবেছিলাম, শুধু চোখে দেখতে পেলেই সৌন্দর্যের ওপর একটা অধিকার জন্মায়। কিন্তু কখনো কখনো সেই সৌন্দর্য ছুঁয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে, ফুল যেমন শুঁকে দেখতে ইচ্ছে হয়! সেই হিপ্নোটিজম্ খেলার সময় আঙুলের ডগায় আপনার থুতনি ছোঁয়ার পর থেকেই এ কথাটা মনে হচ্ছিল। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর দ্বিতীয় কথাটা মনে হতো, মায়া, তোমার পায়ের পাতা একটু ছুঁয়ে দেখবো ?
—পায়ের পাতা ? যাঃ, আপনি কি !
লঘু হাস্যে বললাম, মেয়েদের শরীরের অন্য কোনো অংশ ছোঁয়ার কথা বলতে গেলে, তার আগে বলতে হয় না, আমি তোমাকে ভালবাসি ? আপনার হাত কিংবা ঠোঁট কিংবা চুল ছোঁবার অধিকার চাইবার আগে ভালোবাসার কথা বলতে হয় না ? নইলে ব্যাপারটা অসভ্যতা হয়। কিন্তু আমি তো তা বলতে চাই নি। এটা ভালোবাসার ব্যাপারই নয়। আমি আপনার কাছে অসৎ হতে চাই নি বলেই ভালোবাসার কথা বলি নি। মেয়েদের শরীরে একমাত্র পায়ের পাতাই বিনা দ্বিধায় ছোঁয়া যায়, ওতে অসভ্যতা হয় না। পায়ের পাতা ছোঁয়ার কথা বললে মেয়েরা রেগে যায় না, লজ্জা পায়। তাই ও কথা—
সুস্মিতাও আমার মতন হাল্কা ভাব দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললো,

ধ্যাৎ! হয় আপনি পাগল কিংবা দারুণ রকমের রোমান্টিক। আপনি ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারদের এত রোমান্টিক হওয়া মানায় না!

—আমাকে আগে যা যা মানাতো, আমি সেইগুলোই বদলাতে চেয়েছিলাম!

সুস্মিতা চোখে দুষ্টুমী ফুটিয়ে বললো, ঠিক আছে, আপনার মনের এই ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন? দিন, হাত দিন পায়ে।

—এখানে? রাস্তার মধ্যে?

—আপনি যদি পারেন, আমার আপত্তি নেই!

আমি সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে সুস্মিতার পা ছুঁতে যাচ্ছিলাম, সুস্মিতা ভয় পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, এই, এই, কি হচ্ছে কি? আপনি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি? লোকে কি ভাবতো বলুন তো।

—লোকে কি ভাবে, তা আমি জানতে চাই নি। আমি জানতে চেয়েছিলাম, মায়া আমার সম্পর্কে কি ভাবে!

—চলুন, যা ভিড়, আমি বাসে উঠবো না, আমাকে একটু হেঁটে কয়েক পা এগিয়ে দেবেন। অন্তত দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত।

কয়েক পা এক সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আমি সুস্মিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনো মেয়েলি ব্রত-ট্রত করেছেন?

—ব্রত?

—হ্যাঁ। আজকাল শহরের মেয়েরা কেউ ওসব করে না অবশ্য। তবে বেশ ছিল ব্যাপারটা।

—না, আমি কখনো করিনি। আমাকে কে শেখাবে বলুন, আমার মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন!

এরপর অনেকক্ষণ আমি আর একটাও কথা বললুম না। শেষ বিকেলের আলোয় হেঁটে যেতে লাগলুম ওর পাশে।

॥ ৯ ॥

বাড়িটা একটা গলির ভেতরে, নম্বরটা খুঁজে পেতে খানিকটা সময় লাগলো। তেত্রিশের এফ্। তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা গলির মুখেই, সেই অনুযায়ী পাঁচ খানা বাড়ি পরেই হওয়া উচিত। কিন্তু যেখানে যা থাকা

উচিত, তা থাকে না।
গলিটা বেশ ফাঁকা, জিজ্ঞেস করার মতন কোন লোক পেলাম না। এদিক ওদিক ঘুরছি, এই সময় একটা বাড়ির দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এলো, বেশ বলিষ্ঠকান্তি একজন পুরুষ, দেখলে বক্সার বলে মনে হয়। লোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়েই খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলো, আমি তাকে ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করবো ভেবেও পারলুম না—লোকটি ততক্ষণে গলির মোড়ে পেঁছে গেছে।
আর একটু খুঁজতেই দেখলুম, সেই লোকটি যে-বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেটাই তেত্রিশের এফ্। দেখলে ভাড়া বাড়ি মনে হয় না। বেল টিপলাম।
তিনবার বেল বাজবার পর একজন ঝি দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, অসিতবাবু আছেন?
ঝি শুধু মাথা নেড়ে জানালো, নেই।
—কখন ফিরবেন? কখন ওঁকে পাওয়া যাবে?
ঝি বিশেষ কোনো উত্তর দিতে পারে না। দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। বললাম, বাড়িতে আর কেউ নেই? একটু ডেকে দাও!
আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝি একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েকে ডেকে আনলো। সাদা ফ্রক পরা ফর্সা একটি মেয়ে, চেহারায় সব মিলিয়ে একটা হাঁসের মতন ভাব আছে। মেয়েটি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো—আমি তার বিস্ময়ের কারণ বুঝে একটু একটু হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে রইলাম।
মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?
—অসিতবাবুকে। অসিতবাবু এ বাড়িতেই থাকেন তো?
—হ্যাঁ।
ওঁকে কখন পাওয়া যাবে?
—বাড়িতেই আছেন তো। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।
মেয়েটি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়ে সেজদা, সেজদা বলে ডাকতে লাগলো। সেই ডাক সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। আমি চুপ করে বসে অসিত মজুমদারের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।
বসবার ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। একটি দেয়ালে একটি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার ছাড়া বাকি দেয়ালগুলো ধপধপে সাদা। সোফা-

গুলোতে মাথার তেল নেই। সেণ্টার টেবিলে একটা ফুলদানি, আপাতত সেটাতে কোনো ফুল নেই।
মেয়েটি ফিরে এসে বললো, উনি তো বাড়িতে নেই, এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।
—কখন ফিরবেন?
একটু বাদেই হয়তো ফিরবেন—আমাদের টেলিফোন লাইনটা খারাপ হয়ে গেছে, উনি অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করতে গেছেন। অবশ্য সেখান থেকে বাড়ি না ফিরে যদি অন্য কোথাও যান—
মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। নীরস ভাবে কথা না বলে আমার সম্পর্কে সে বেশ উৎসাহী মনে হলো, ঘন ঘন আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তা তো তাকাবেই।
—আমি কি একটু অপেক্ষা করতে পারি?
—হ্যাঁ, বসুন না! আপনার কি আসবার কথা ছিল?
—না, ঠিক কথা ছিল না—তবে একটা দরকার আছে ওঁর সঙ্গে।
মেয়েটি এবার ঠোঁট ফাঁক করে হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনি ওকে চেনেন? আমিও হেসে বললাম, হ্যাঁ চিনি।
মেয়েটি আমার সঙ্গে আর কথা না বলে লেটার বক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো। ইলেকট্রিকের বিল ছাড়া আর কিছুই আসে নি, সে তবু শূন্য ডাক বাক্সে হাতড়িয়ে আরও কোনো চিঠি খুঁজতে লাগলো। সব মেয়েই যে-রকম খোঁজে।
বক্সারের মতন চেহারার যে-লোকটিকে একটু আগে এ বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, সেই লোকটি আবার ফিরে এলো। আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, মেয়েটি তাড়াতাড়ি বললো, সেজদা, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এই অসিত মজুমদার? এই শক্ত দৃঢ় লোকটি? এর সঙ্গে সবাই আমার হুবহু মিল খুঁজে পায়, আর আমি একে গলির মধ্যে দেখে চিনতে পারিনি। এখনো তো আমি কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না! তাহলে কি পুরো ব্যাপারটাই ফ্যানটাসি? একদল লোক ষড়যন্ত্র করে এই কাল্পনিক ব্যাপারটা খাড়া করেছে, আমাকে জব্দ করার জন্য! অসিত মজুমদারও তো আমাকে চিনতে পারে নি, সেও তো আমাকে দেখে চমকে ওঠে নি!

কিংবা এটাও হতে পারে, আর সবাই মিল খুঁজে পায়, শুধু আমরাই দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ নিজের চেহারাটাই সব চেয়ে কম চেনে। আয়নায় শুধু আমাদের মুখের সামনের দিককার টু ডাইমেনশানাল ছবি দেখতে অভ্যস্ত। তাও ডান দিক চলে যায় বাঁ দিকে। হয়তো আমাদের আদৌ সেরকম দেখতে নয়। কোনো মানুষই যেমন নিজের গলার আওয়াজটা ঠিক কি রকম জানে না।

বস্তুত প্রায় সব মানুষই নিজের সম্পর্কে খুব কম জানে,—অন্যের স্বার্থপরতা তার ঠিক চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের স্বার্থপরতাকে মনে করে মহত্ত্ব। অন্যের ফোঁড়া দেখলে ঘেন্না করে, কিন্তু নিজের ফোঁড়ায় হাত বুলোয় আদর করে। মশা মারার পর তার পেটে নিজের রক্ত দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বেগমপুর স্টেশনে অসিত মজুমদারের দুই বন্ধু বলেছিল, "সাইড থেকে ঠিক ওর মতন দেখতে!" আমি ঘাড় সরিয়ে ওকে পাশ থেকে দেখার চেষ্টা করলাম! তাও চিনতে পারলাম না একটুও। নিজেকে তো কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে পাস থেকে দেখিনি! সেলুনে চুল কাটার পর মাথার পেছনে নাপিত যখন একটা আয়না ধরে, তখন কতবার একটা অচেনা ঘাড় দেখে বলেছি, বাঃ, বেশ হয়েছে!

অসিত মজুমদার কিশোরী মেয়েটিকে বললো, তুতু, দাদাকে গিয়ে বলু, বৌদি ভালো আছে। ফোন করেছিলাম—

তারপর আমার মুখোমুখি বসে কৌতূহলীভাবে চেয়ে বললো, আপনি আমার কাছে এসেছেন?

—হ্যাঁ! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, আপনাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে! কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো!

তা হলে অসিত মজুমদারের অবস্থাও আমারই মতন। সেও কখনো সাইড থেকে নিজেকে দেখেনি, সেলুনে অপরিচিত ঘাড় দেখে সেও বলেছে, বাঃ, বেশ ভালো!

আমি বললাম, আলাপ কখনো হয়নি অবশ্য। তাই আলাপ করতে এলাম। আমার নাম জ্যোতি রায়চৌধুরী।

মানুষ মাঝে মাঝে সামনে চেয়ে থেকেও উল্টো দিকে তাকায়। নিজের ভেতরটা দেখে। সেই রকম ভাবে চেয়ে থেকে অসিত মজুমদার কিছুক্ষণ

চিন্তা করলো। তারপর ভদ্রতার ছদ্ম বিনয় দেখিয়ে বললো, মাই মেমরি ইজ টেরিবলি পুয়োর! আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

এবার আমি আন্তরিকভাবে হেসে বললাম, খুবই স্বাভাবিক, আপনি আমার নাম কখনো শোনেন নি। আমি কোনো বিখ্যাত লোক নই। কিন্তু অনেকে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কোথাও মিল আছে। মানে, অনেক সময় আপনার-আমার আইডেনটিটি বদলা-বদলি হয়ে যায়!

অসিত মজুমদার এবার সবিস্ময়ে বললো, ওঃ হো, আপনিই সেই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথা অনেকবার শুনেছি! আমাকেও অনেকে অন্য লোক বলে ভুল করেছে মাঝে মাঝে। সেই জন্যেই আপনার নামটা একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল!

- আপনি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন?

না। আমি তো সে রকম কিছু দেখছি না।

—আমিও না।

—তা হলে দেখুন তো ব্যাপারটা! দু'জন মানুষ কখনো একরকম হয়? মায়ের পেটে যমজ ভাই হলে হতেও পারে—সে রকম দু'জনকে দেখেছিলাম একবার—ঘাটশীলায় বেড়াতে গিয়ে—তাও আমি একদিন ভালো করে স্টাডি করার পর দু'জনকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারতাম। আর আপনার সঙ্গে আমার যদি কোনো মিল থাকেও—তা খুবই সামান্য নিশ্চয়ই—লোক যে কেন ভুল করে! লাইফ ইজ ফুল অব মিস্ট্রিজ! কি বলেন?

আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, যমজদের আলাদা করে চেনার ক্ষমতা আমার নেই। আমিও এরকম যমজ দেখেছি। অসিত মজুমদার একটু জোরে কথা বলতে ভালোবাসে। বেশ একটু আত্মতৃপ্ত ভাব। মানুষ জন্মটা পেয়ে সে যতদূর সম্ভব ভোগ করে নিতে চায়। মাঝে মাঝে ইংরেজি বলাও ওর স্বভাব। এগুলো আমার থেকে আলাদা—ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখাই আমার থেকে আলাদা—ওর হাসির দৈর্ঘ্য এবং কণ্ঠস্বর নিক্ষেপের ধরণও। এগুলো বোঝা যায়।

আমাকে দেখে অসিত মজুমদার বেশ আমোদ পেয়ে গেছে। বললো, খুব ভালো করেছেন এসে। একটা মিসট্রি সলভ্‌ড হলো এতদিনে। আপনার তাড়া নেই তো। চা খাবেন নিশ্চয়ই! ওই দেখুন, দেখুন—ভেতরের দরজার কাছে সেই কিশোরী মেয়েটি আর একটি মেয়েকে ডেকে

এনে উৎসুকভাবে দেখেছে আমাদের। নিশ্চয়ই ওরা দু'টি এক চেহারার মানুষের মুখোমুখি বসে থাকার দৃশ্য উপভোগ করছে। অথচ আমরা পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা।

মেয়েরা একটু বেশী মিল খুঁজে পায়। যে-কোনো অচেনা লোক দেখেই তারা কোনো চেনা লোকের সঙ্গে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করে। ফেরিওয়ালার সঙ্গে সিনেমা স্টার অনিল চ্যাটার্জি'র কিংবা বিশ্বজিতের সঙ্গে সেজমাসীর দ্যাওরের মিল খুঁজে পেতে শুনেছি আমি মেয়েদের মুখে। সুস্মিতাও আমার মধ্যে অসিত মজুমদারের মিল বেশী দেখেছিল, তাই চেহারার ব্যাপার সে ভুলতে পারে নি।

চায়ের হুকুম দিয়ে অসিত মজুমদার বললো, ভাগ্যিস্ আপনি মশাই আমাদের অফিসে চাকরি নেন নি—তা হলেই এক কীর্তি হতো! একে তো নামের ঠেলাতেই অন্ধকার—

—কেন, কি হয়েছে?

—তিনজন অসিত আমাদের অফিসে। তার মধ্যে একজন আবার মজুমদার! বুঝুন ঠেলা! কেউ অসিতবাবু বলে ডাকলে তিনজন সাড়া দিই। টেলিফোনে অহরহ গণ্ডগোল হয়! তাও তো যে মজুমদার তাকে ধরে একদিন জেরা করতে বেরুলো, সে আসলে গুহ মজুমদার, গুহ-টা বাদ দিয়েছিল। এখন আমি তাকে পুরো গুহ মজুমদার লিখতে ইনসিস্ট করি! আমার তো কখনো ছেলে-টেলে হলে নাম রাখবো ধৃষ্টদ্যুম্ন কিংবা বভ্রুবাহন—যাতে অন্য কারুর সঙ্গে না মেলে।

—মিল থাকলেই বা ক্ষতি কি?

—এই, বুঝলেন না, অন্য একজনকে ডাকছে, আমি সাড়া দিচ্ছি—এটা একটা আনক্যানি ব্যাপার নয়? কতদিন তো ক্যানটিন থেকে বেয়ারারা অন্য অসিত মজুমদারের খাবার আমাকে দিয়ে গেছে, আমি খেয়েও নিয়েছি! একদিন এক বেয়ারা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এলো—তিনি এসেছেন অসিত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারছি না, বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোঝা গেল—একটা ভুল হয়ে গেছে। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, ভদ্রমহিলাকে দেখতে দারুণ ছিল—অ্যাট ওয়ান পয়েণ্ট, আই ওয়াজ অলমোস্ট টেম্‌পটেড টু প্লে দা রোল অফ—

—দেখুন, এখানেও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

—কি ?

—হয়তো আমার সঙ্গে আপনাদের অফিসের ঐ অন্য অসিত মজুমদারেরই চেহারার মিল—

—না, না, তার কোনো চান্স নেই। সেই অসিত গুহ মজুমদার বেঁটে আর কালো। আপনার সঙ্গে তো আমার তবু হাইটে মিল আছে, বয়েসটাও কাছাকাছি,—দাঁড়ান, প্রমাণ করে দিচ্ছি। এই তুতু, এদিকে আয় তো !

সেই সাদা ফ্রক পরা কিশোরী মেয়েটি তখনও দরজার কাছাকাছি ছিল। সে এসে ঘরে ঢুকলো। অসিত তাকে জিজ্ঞেস করলো, ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ তো ! এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে ? মেয়েটি মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, দারুণ মিল ! হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না—

অসিত ঘর ফাটিয়ে হাসলো। ব্যাপারটা সে খুব উপভোগ করছে। আমার কিন্তু হঠাৎ একটু ক্লান্ত লাগলো। কেন জানি না, অসিত মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে আমার আর ভালো লাগছে না। এই লোকটি বড় বেশী প্রাণবন্ত, পৃথিবীতে নিজের জায়গাটা এই লোকটি বড় বেশী অধিকার করে আছে। আমার চরিত্রে যা-যা নেই, এর মধ্যে ঠিক সেইগুলিই ভরপুর। কিন্তু ঐ সমস্ত গুণগুলো আমার কাম্য নয়। অসিত মজুমদার জীবনে যা পায়নি, যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, শুধু সেটাই আমার পেতে ইচ্ছে করছে।

অসিত বললো, দেখলেন তো ? দেখলেন ! এখন তো আমারই মনে হচ্ছে, সত্যিই আমিও আপনার চেহারায় আমার মিল খুঁজে পাচ্ছি। ঠিক আছে তুতু, তুই ভেতরে যা —

আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে নিজে একটা ধরিয়ে অসিত হালকা-ভাবে বললো, আসুন না, দু'জনে জীবনটা একটু বদলা-বদলি করা যাক্ কিছুদিনের জন্য। আপনি আমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন, আমি থাকবো আপনাদের বাড়িতে, অফিসটাও এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে···আপনার কোন্ অফিস ? আপনি বিয়ে করেন নি নিশ্চয়ই ?

প্রশ্নটা করে অসিত মজুমদার গোপনভাবে হাসলো। উত্তর না দিয়ে আমিও হাসলুম। অর্থাৎ অন্যের মা-কে মা বলে ডাকা যায়, অন্যের বিছানায় নিজের মতন করে শোয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রেই মুস্কিল !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, জীবন বদলাতে চাইছেন কেন ? এ জীবন কি অসহ্য হয়ে গেছে নাকি ?

—না, তা নয়। তবু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না, জীবনটা বদলাতে ! একটু অন্য রকম ! বুঝলেন, আমাদের অফিসের ইউনিয়নে একটা ট্রাবল চলছে, আমি আবার ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি—খুব ফাইট দিচ্ছি —কিন্তু এক এক সময় ইচ্ছে করে একটু বিশ্রাম নিই। কিন্তু মরে না গেলে, কিংবা চাকরি না ছাড়লে আর বিশ্রাম নেই !

—নিশ্চয়ই, জয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া চলে না।

—জয়ের কি শেষ আছে ? আমি ইউনিয়নের যতগুলো কেস নিয়ে ফাইট দিয়েছি, তার একটাতেও হারিনি। বুঝলেন, আমার রেকর্ড আছে। সেইজন্যই আমাকে প্রত্যেকবার সেক্রেটারি করে। তবে কি জানেন, লড়াইয়ের শেষ নেই, একটার পর একটা···জয় কাকে বলে বলুন ?

অসিত আমাকে একটা শক্ত প্রশ্ন করে অসুবিধেয় ফেলেছে। আমি জীবনে অনেক জায়গায় হেরেছি। আর ও আমাকে বলছে জয়ের কথা। ওকেও একটু অসুবিধেয় ফেলা দরকার। সেই জন্য, আমি চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি মায়াকে চেনেন ?

—মায়া ? কে মায়া ? মায়া কি ?

—না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনি সুস্মিতাকে চেনেন ?

—সুস্মিতা ?

অসিত আমার দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। আত্মস্থভাবে সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে বললো, হ্যাঁ চিনি ! কেন, বলুন তো ?

—এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।

—আপনি সুস্মিতাকে চেনেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—সুস্মিতা এক সময় এ বাড়িতে খুব আসতো। এখন আর আসে না। এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা আমার পক্ষে ভদ্রতাসম্মত নয় বলেই আমি চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, আমি তা হলে চলি এবার—

—না, না, আর একটু বসুন।

—আর বসার উপায় নেই। আমাকে যেতে হবে।

—আর একটু বসুন না !

—না।
—চলুন, আপনাকে আমি মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।
গলিপথটা আর কোনো কথা বললাম না আমরা। মোড়ের মাথায় এসে অসিত জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, সে কথা বললেন না তো ?
—কোনো কারণ নেই, এমনিই।
—কোনো কারণ নেই ?
—না, সত্যিই। এমনিই অনেকদিন থেকে আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল।
—কি দেখলেন ?
হালকাভাবে হাসলুম। আসল কথাটা অসিতকে বলা যায় না। সুস্মিতা বলেছিল, সে অসিতকে ঘৃণা করে। আমি দেখতে এসেছিলুম সেটা সত্যি কিনা। অথবা, সত্যিই অসিতকে ঘৃণা করা সম্ভব কি না।
না, অসিতকে ঘৃণা করার কিছুই নেই। সে ভারী চমৎকার মানুষ। প্রাণবন্ত, আমার চেয়ে ওর স্বাস্থ্য ভালো, মনটা সরল, কথা বলে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু অসিতও আংশিক মানুষ। আমারই মতন। আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তার কিছু লোক আমাদের ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। আসল অসিত আর আমি একজনই মানুষ, তাসের তলা আর ওপরের মতন। অসিত আর আমি পরস্পরের পরিপূরক।—পৃথিবীতে পূর্ণ মানুষ একজনও আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু অসিত আর আমার চেহারার খানিকটা মিল আছে বলেই আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের চরিত্র মিলিয়ে নিতে পারছি। না, খেলাটা আবার শুরু করতে হবে। আসানসোলে যে-খেলাটা আরম্ভ করেছিলাম।
সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না, অসিত মজুমদার আমার জন্য ট্যাক্সি ধরে দেবার চেষ্টা করছে। তার ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা আছে। আরোও দু' একটা ছোটখাটো কথা বললো আমার সঙ্গে, তারপর এক সময় জিজ্ঞেস করলো, আপনি সুস্মিতাকে কতদিন ধরে চেনেন ?
—বেশীদিন নয়, এমনিই চেনা আর কি !
—হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন ?
—না, মানে, সুস্মিতার মুখে দু' একবার আপনার নাম শুনেছিলাম।
—আমি তো ওর কাছে কোনোদিন আপনার নাম শুনিনি ?

—নাম করার মতন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কিছু নয়।

—সুস্মিতার সঙ্গে এক সময় আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু আমার জীবনের এই একটা মিস্ট্রি, ও যে হঠাৎ কেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল···একমাত্র ওর কাছেই আমি হেরে গেছি!

মুখে কিছু বললাম না, চোখ দিয়ে বললাম, সে কথা আমি জানতাম! হয়তো, বেগমপুর স্টেশনে ট্রেনের জানলায় প্রথম যখন ওকে দেখি, তখনই আমার অবচেতন মন এটা টের পেয়েছিল। তাই এই খেলাটায়—

আমি মনে মনে বললাম, অসিত, আমি জীবনে অনেক কিছুই পারবো না, অনেক কিছুতেই ব্যর্থ হবো। তোমার ওপর ভার দিলুম, তুমি সেগুলোতে সার্থক হয়ো। আমার অনুরোধ রইলো। আমিও কথা দিচ্ছি, তোমার স্বভাবের অপূর্ণ অংশগুলো আমি পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করবো। আমি কথা দিচ্ছি।

॥ ১০ ॥

—মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

ও প্রথমটায় শুনতে পায় নি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

আবার খেলা শুরু হলো। সুস্মিতা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে ঝলমলে ভাবে হাসলো, বললো, বাঃ, চিনতে পারবো না কেন? বরং আপনিই আমাকে চিনতে পারছেন তো?

—আমি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই চিনি।

—গত সপ্তাহে আমি আপনাকে ট্রামের জানালা দিয়ে ডাকলাম। আপনি সেদিন আমাকে দেখেও দেখতে পেলেন না।

—সেদিন আমাকেই দেখেছিলে তো?

—হ্যাঁ।

—মায়া, তোমার ভুল হয় নি?

—না!

অসিত মজুমদার আমার পাশেই বসে আছে। হাতে মাংসের টুকরো, মুখটা আক্ষরিক অর্থে হাঁ। সে স্তম্ভিতভাবে আমাদের কথা শুনছে।

সুস্মিতা কথা বলছে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

অসিত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অত কষ্ট করে ঠিকানা জোগাড় করে তার বাড়িতে যাওয়ার দরকার ছিল না। যে-নাটকে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি, সেই নাটকের একটি দৃশ্যে অসিতের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। রেবার বিয়ের পর একটা পার্টি দিয়েছে, রেবার নতুন স্বামীর বন্ধু অসিত সেখানে নেমন্তন্ন পাবেই, এবং রেবার ভূতপূর্ব স্বামীর বন্ধু হিসেবে আমিও।

আমি আর অসিত পাশাপাশি খেতে বসেছিলাম। অন্যদের আনন্দ দেবার জন্য। আজ আমরা দু'জনেই ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেছি, আজ অন্যদের চোখে আমাদের মিল আরও প্রকট। অন্যরা আমাদের নিয়ে বেশ আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছিল।

কিন্তু আমরা পাশাপাশি বসেছি বলেই, আমাদের মিল সত্ত্বেও, কেউ আজ আমাদের অন্যজন হিসেবে ভুল করেনি। একজনও আজ আমাকে অসিত বলে ডাকে নি, আর জ্যোতি বলে ডাকার মতন লোক এই নেমন্তন্নের আসরে খুব কমই এসেছে। পাশাপাশি বসেছি বলেই আজ আমাদের স্বভাবের ছোটখাট অমিলগুলো অন্যদের চোখে পড়েছে, চেহারার মিলটা আজ গৌণ। আজ আমরা আলাদা মানুষ!

অসিত গোড়া থেকেই বেশ খুশী মেজাজে ছিল। প্রায় শ' খানেক নিমন্ত্রিতের মধ্যে, অনেকেই তার চেনা! তাদের সবার সঙ্গেই সে হাসিঠাট্টা করছে, আমার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অনেকের। পরিচয় করানোর সময় আমাকে দেখিয়ে বলেছে এই যে, ইনি আমার প্রটোটাইপ!

আমি তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করছিলাম, অসিতের চোখ বিশেষ কারুকে খুঁজছে কিনা। অসিত নিজের মনের ভাব বেশ লুকোতে জানে, কারণ, বিশেষ কারুকে খুঁজলেও তার চোখ দেখে তা বোঝা যায় না। আমি অবশ্য গোড়া থেকেই এসে সুস্মিতাকে খুঁজছিলাম।

অসিত বেশ জনপ্রিয়, অনেকেই তাকে ভালোবাসে—অন্যরা যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলছিল, তা থেকেই বোঝা যায়। দু' তিনটি সুন্দরী যুবতী অসিতের সঙ্গে কথা বলার সময় গলার আওয়াজে রীতিমতন আর্দ্রতা এনে ফেলেছিল। অসিতকে রীতিমতন ঈর্ষা করা যায়, কিন্তু আমি তো চাই, অসিতই আমাকে ঈর্ষা করবে। এ খেলাটাই এরকম। কিন্তু সুস্মিতা,

আসেনি।

এক সময় অসিত বললো, চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক্‌ !

—আরেকটু পরে। এখনো তো বেশী রাত হয়নি ?

—কম কি, পৌনে ন'টা। এর পর আর খিদে থাকে না। আসুন না, খাওয়াটা সেরে ফেলি, তারপর না হয় গল্প করা যাবে !

রেবাই এখানে আমার একমাত্র চেনা। কিন্তু আজকের দিনে সে আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ গল্প করবে—তা আশা করা যায় না। রেবাকে শুধু আমার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, হিমানীশের যে সোনার হাতঘড়িটা এতদিন রেবার কাছে যত্ন করে রাখা ছিল, সেটা সে তার নতুন স্বামীকে পরতে দিয়েছে কিনা। জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। যাই হোক, অসিতই আমার বন্ধুর ভূমিকা নিয়েছিল। আর, একা একা খাওয়ার চেয়ে কারুর সঙ্গে খাওয়াই ভালো।

যদিও সুস্মিতাকে না দেখে আমি মুষড়ে পড়েছিলাম—আমার মনোবল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আর মন খারাপ থাকলে কি আর ক্ষিদে থাকে ? অসিত কিন্তু বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। পৃথিবীতে সে সব কিছু ভোগ করার জন্য, সব কিছু জয় করার জন্য এসেছে। সে এত জয়লোভী বলেই তাকে একবার হারতে হবে। আমি জীবনে বারবার হেরেছি, আমাকে তো একবার অন্তত জিততে হবেই, না হলে চলবে কেন ? না হলে আমাদের জীবন পরিপূরক হবে কেন ?

খাওয়ার মাঝপথে যখন মাংস এসেছে, সেই সময় সুস্মিতাকে দেখলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ের পার্টিতে তার এত দেরী করে আসা উচিত হয়নি। খুব সেজেছে আজ সুস্মিতা, লেমন ইয়েলো রঙের সিল্কের শাড়ী পরেছে, নিশ্চয়ই শাড়ীটা নতুন ! আমরা যেখানে বসেছি, সুস্মিতা তার থেকে অনেক দূরে দূরে ঘুরছে। যাই হোক, ব্যস্ততার কিছু নেই। দেখা হবেই। এদিকে সে একবারও তাকায় নি, কিন্তু আমি ধ্রুব নিশ্চিত, সে আমাদের দু'জনকেই দেখেছে।

আমি যে-সারিতে বসেছি, তার উল্টো সারি থেকে একটি মেয়ে সুস্মিতার নাম ধরে ডাকলো। সুস্মিতা সেখানে এসে আমাদের দিকে পেছন ফিরে কথা বলতে লাগলো মেয়েটির সঙ্গে।

এবার আর মনে মনে নয়, এবার আমি বেশ জোরে বললাম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?

সুস্মিতা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝলমলে ভাবে হাসলো। দু' এক পলক চোখাচোখি হলো, সেই দু'এক পলকের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল। আমি সেই হিপ্নোটিজম্ খেলার মতনই, সুস্মিতার দিকে চোখ রেখে মনে মনে বললাম, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো। এখন আমরা পাশাপাশি আছি, এখন আর শুধু চেহারা দেখো না। মানুষকে ঘৃণা করতে নেই, মানুষকে ভালবাসতে হয়। তুমি মানুষের একটা অংশকে ঘৃণা করেছো, এবার তার অন্য অংশকে ভালোবাসো। জয়ীকে পরাজিত করেছো তুমি, এবার পরাজিতকে জয়ী করো।

এবার আর কানে কানে ফিসফিস করে বলতে হলো না, ভাণ করুন, প্লিজ, ভাণ করুন। এখন আমাদের সেই জীবন-বদলের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এ খেলার কোনো নিয়ম নেই। এবার সুস্মিতা নিজের থেকে বললো, বাঃ, চিনতে পারবো না কেন ? বরং আপনিই আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

বিস্মিত অসিত তার হাতের মাংসের টুকরোটা প্লেটে নামিয়ে রাখলো। সুস্মিতা ওর দিকে একবারও চোখ রাখে নি। অসিত নীরস গম্ভীরভাবে বললো, সুস্মিতা, তোমার নাম আবার মায়া কবে থেকে হলো ?

আমার ভয় হলো, সুস্মিতা হয়তো উত্তর দেবে না। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। আমি বন্ধুর মতন হেসে অসিতকে বললাম, আপনি জানেন না ? মায়া তো ওর ডাক নাম !

সুস্মিতা অন্যদিকে চোখ রেখেই উদাসীনভাবে বললো, হ্যাঁ, মায়া আমার ডাক নাম। অনেকদিন আমাকে এই নামে কেউ ডাকে নি।

সুস্মিতার এই কথা বলার সুরে এমন একটা অদ্ভুত দুঃখের সুর ছিল যে আমি আর অসিত দু'জনেই একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

সুস্মিতা আমাকে বললো, আপনি খেয়ে নিন। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—তুমি কোথায় থাকবে ? তোমাকে কোথায় খুঁজে পাবো ?

—আমি আপনাকে খুঁজে নেবো।

সুস্মিতা চলে যাবার পর আমরা দু'জনেই, আবার খাবারে মনঃসংযোগ করলাম। আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না একটুও, শুধু অসিতকে সঙ্গ দেবার জন্য নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। অসিত ধীরেসুস্থে সব ক'টা মাংস শেষ করলো। তারপর সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। তার

মুখখানা বিবর্ণ রক্তশূন্য। হঠাৎ নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো আমার।

অসিত খুব ম্লান গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি সুস্মিতাকে বুঝি অনেক দিন থেকে চিনতেন? সেদিন আমাকে এ কথা বলেন নি তো! আপনি ওর ডাক-নাম পর্যন্ত জানেন! মায়া যে ওর ডাক-নাম তা আমি জানতাম না, কোনোদিন বলেনি।

আমি খুব তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ, ওকে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই চিনি বলা যায়। মাঝখানে অনেকদিন দেখা হয়নি।

—সুস্মিতা আমাকে এ কথা কখনো বলেনি তো! আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে, সুস্মিতা আপনার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিল! আমাকে ভেবেছিল জ্যোতি—

—না, না, তা নয়।

—হ্যাঁ, তাই।

আমি অসিতের চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকালাম। অসিত একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জয় কাকে বলে? অসিতই ঐ প্রশ্নের উত্তর জানে, আমি জানি না।

আমি ওকে অত্যন্ত মিনতি-ভরা গলায় বললাম, আপনি যা জানেন, তা সত্যি নয়। ওর চোখে আপনি আলাদা, আমি আলাদা। আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে, অসিত একটা বিচারের বাণী উচ্চারণ করার মতন বললো, না।

লম্বা টানা বারান্দা, একটু আগে এখানে অতিথিরা বসেছিল, এখন সবাই খেতে গেছে। শুধু সুস্মিতা আর আমি। পিছনে উৎসবের কলরব, আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই হালকা লেমন ইয়োলো রঙের শাড়ীটা নতুন কিনেছো?

সুস্মিতা লাজুকভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ, সেই যে আপনি বলেছিলেন। কি, আমাকে সে রকম মানিয়েছে?

—এখন বলবো না সে কথা।

—কেন? তা হলে কোথায় বলবেন?

—একদিন কিংবা এক্ষুণি গঙ্গার পাড়ে, স্ট্রাণ্ডের কাছে যেতে হবে। সেখানে

আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবো। তুমি খুঁজবে আমাকে, খুঁজতে খুঁজতে যখন পাবে, তখন বলবে, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আপনাকে আমি কতক্ষণ থেকে খুঁজছি—! আমি তখন বলবো—

—এটাও কি সেই খেলা?

—হ্যাঁ।

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সুস্মিতা। আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার মুখ, চোখের পাতায় যেন অভ্র ছড়ানো, রেলিং-এর ওপর ফর্সা নরম হাতখানি রাখা। সুস্মিতা বললো, আচ্ছা যাবো—।